ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী
অনুবাদঃ আবদুল কাদের

ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদঃ আবদুল কাদের

ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
মূলঃ ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী
অনুবাদঃ আবদুল কাদের

সপ ৬৫ ই৩
প্রকাশক
সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড
করিম চেম্বার (পঞ্চম তলা)
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ২৩২৮১৭, ২৩৩২৯৪

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৯৭
মার্চ,১৯৯১

মুদ্রক
পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
করিম চেম্বার (নিচ তলা)
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০ ॥ বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISLAME AURTHONOITIK NIRAPOTTA
(Financial Security in Islam)
Text: DR. Yusuf Al Qurazavi
Translated in Bengali by Abdul Kader
Published by Srijan Prokashoni Limited, Dhaka
First Print: March, 1991
Price : Tk. 50.00

অনুবাদকের কথা

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা শুধু এ কালেরই সমস্যা নয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ এই সংকটে ভুগছে। পেটের চাহিদা পূরণের জন্যে মানুষ সব সময়ই তৎপর। তবে, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সংকটই মানুষের সবচেয়ে বড় সংকট। এই সংকট সমাধানের প্রশ্নে মানুষ পাগলের মত ব্যস্ত। ফলে মানুষ বোধশূন্য অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তা-ভাবনা করার শক্তিও আজ তার অবলুপ্তপ্রায়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় যে কথাই বলা হয়, পরিণাম চিন্তা না করে মানুষ সেই দিকেই ধাবিত হয়। নাস্তানাবুদ না হওয়া পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকানোর অনুভূতিও থাকে না। একেক সময় সে একেক পথ অবলম্বন করে। কিন্তু কোন পথেই কাংখিত লক্ষ্য হাসিল হয় না। অধিকন্তু সে হতাশা ও বঞ্চনার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরিবর্তে সে আরো ন্যুব্জ হয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ এবং দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা থেকে মুক্তির জন্যে এই বিশ্ব কতবারই না রক্তে রঞ্জিত হয়েছে! দুর্ভাগ্য, মানবতার তমসাচ্ছন্ন রাতের পরিসমাপ্তি ঘটে সুবহে উম্মিদ আর কখনো আসেনি।

বর্তমান যুগের মানুষ অসংখ্য পথে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সন্ধান করছে। ইসলাম সেই সব পথের অন্যতম পথ। এই পথ অনুসরণ করলে মানুষ সকল বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থেকে মনযিলে মকসুদে পৌছতে সক্ষম হয়। মানুষের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা মোচনে ইসলামপ্রদত্ত নকশা অত্যন্ত সমান্তরাল ও ভারসাম্যপূর্ণ। এতে সমষ্টি ও ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলাম সমষ্টিকে এমন নির্যাতনমূলক ক্ষমতা প্রদান করে না, যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব, চিন্তাশক্তি এবং শারীরিক যোগ্যতা বিকল, কর্মের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত এবং মেহনত ও শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলাম ব্যক্তিকেও এমন স্বাধীনতা প্রদান করে না, যাতে অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। ইসলাম একদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের শক্তি এবং যোগ্যতা প্রদর্শন ও ফল থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে; তার শ্রম ও মেহনতের ফলকে পবিত্র মনে করে এবং তাতে কারো হস্তক্ষেপ অবৈধ মনে করে। অন্যদিকে ইসলাম ব্যক্তিকে কারোর অধিকার লংঘন এবং কারো সাথে ধোকাবাজির অনুমতিও দেয় না। ইসলাম একদিকে মানুষের অন্তর ও চিন্তাকে পবিত্র করে এবং তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, ত্যাগ, হামদরদী ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুণাবলী সৃষ্টি করে মানুষের সাথে ইহসান এবং সুন্দর আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম অক্ষম এবং দুর্বলদের বেঁচে থাকার জন্যে বিত্তশালীদের সম্পদে অধিকার নির্ধারণ করে। সম্পদ যাতে কোন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হতে না পারে সে জন্যে সুদ হারাম করে। আবার উত্তরাধিকার আইন এবং যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টনের ব্যবস্থা করে। ইসলাম যেমন

সম্পদশালীকে নিজের কর্মচারী এবং শ্রমিকের কল্যাণের নির্দেশ দেয়, তেমনি শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকেও নিজের দায়িত্ব আমানত এবং দিয়ানতের সাথে পালন ও মালিকের শুভ কামনার অধীন করে দেয়। বস্তুত ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, প্রীতি ও সুস্থতারই বিধান। এই বিধান পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এবং শ্রেণী সংঘাতের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। এই বিধানই মানব সমাজের যথার্থ শান্তি এবং নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পারে।

আজকাল মুসলিম সমাজ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, ইসলাম সেকেলে বা তথাকথিত কোন ধর্ম নয়, বরং ইসলাম একটি পূর্ণ জীবন বিধান। এই বিধান মানুষকে অহেতুক ক্ষুধা ও বুভুক্ষায় বিপর্যস্ত হওয়া এবং দানের রুটির ওপর জীবন অতিবাহিত করার জন্যে "তাওয়াকুল"-এর রাস্তা প্রদর্শন ও সব কিছুকে "আল্লাহর ইচ্ছা" আখ্যায়িত করে মাথা অবনত করার শিক্ষা দানের কোন বাতিল বিধান নয়। ইসলামী বিধান মানুষকে নীচু থেকে উঁচু স্তরে টেনে তোলে। মানব জাতির সকল সমস্যার সঠিক সমাধান এবং মন ও আত্মার যথার্থ প্রশান্তি এই বিধানেই নিহিত। ইসলাম উন্নত, সর্বাধুনিক এবং চরম প্রগতির বিধান।

এটি সেই বিধান যা বঞ্চিতদেরকে কোনভাবেই মসজিদের দরজায় হাত পাতা অথবা ভিক্ষাবৃত্তিকে তাদের জীবিকা হিসেবে মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেয় না, বরং হাত পাতাকে "আসসাওয়ালু জিল্লুন" অর্থাৎ ভিক্ষাকে ঘৃণার কাজ বলে আখ্যায়িত করে মানুষকে বাঁচায় এবং "হাকুল লিস সায়িলি ওয়াল মাহরুম" বলে বিত্তশালীদের নিকট অধিকার দাবীর পূর্বেই তাদের হক বা অধিকার প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে।

প্রিয় নবী (সঃ) দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে কখনই "আল ফাখরী" বা আমার গৌরব বলেন নি। বরং সব সময় আল্লাহর নিকট দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি একবার দারিদ্র্যকে মুসিবত আখ্যায়িত করে বলেছিলেনঃ এ থেকে তোমরা নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা কর। কারণ দারিদ্র্য কুফরের দিকে নিয়ে যাওয়ার মত মুসিবত। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এমন অনেক দোয়া করেছেন যাতে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করেছেন। তিনি মুসলমানদেরকেও পরওয়ারদিগারের নিকট তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত লাভের জন্যে দোয়া করতে বলেছেন। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষায় মানুষের মর্যাদাবোধের মৃত্যু এবং আত্মশক্তির বিনাশ ঘটে। উপরন্তু এতে আত্মমর্যাদা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের মধ্যে এই সকল গুণের পূর্ণ বিকাশের পক্ষপাতী।

'ইসলামের যাকাত বিধান' ও 'হালাল-হারাম' গ্রন্থের লেখক ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী বর্তমান যুগের ইসলামী বিশ্বের একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি "মুশকিলাতুল ফিকর ওয়া কাইফা আ'লাজাহাল ইসলামু" গ্রন্থে দারিদ্র্য এবং বুভুক্ষা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক ইসলামের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু একটি অধ্যায়মাত্র। বিশেষ গুরুত্বের কারণে এটি একটি পুস্তকের আকার ধারণ করেছে।

বর্তমান পুস্তকে লেখক ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ এবং ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু চিত্র এঁকেছেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামী অর্থনৈতিক শিক্ষাবলীর ওপর আলোচনা করেছেন। শুধুমাত্র ইসলামের ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থাই মানব সমাজকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে, তা তিনি সাফল্যের সাথেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্তমান যুগে প্রচলিত পূঁজিবাদী এবং সমাজবাদী অর্থনীতির রূঢ় ও নির্যাতনমূলক চিত্রও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর চিন্তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও গভীর। তাঁর বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, যুক্তিসম্মত, মজবুত ও মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী।

প্রফেসর আবদুল হামিদ সিদ্দিকী পুস্তকটি আরবী ভাষা থেকে উর্দূতে তরজমা করেছেন। সুপণ্ডিত প্রফেসর সাহেব উর্দূ তরজমাতে খুবই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) জীবদ্দশাতে তাঁর প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা "তরজমানুল কুরআনে" সম্পাদনাসহ ধারাবাহিকভাবে বইটি প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বই-পুস্তক বর্তমানে পাওয়া যায়। কিন্তু ডঃ ইউসুফ আল কারযাভীর এই পুস্তকটি ভিন্ন ধরনের হওয়ায় তা আমি অনুবাদ করেছি। অনুবাদটি সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা"য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল থেকেই সহৃদয় পাঠকবৃন্দ বইটি প্রকাশের তাগাদা দিয়ে আসছিলেন। সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড বইটি প্রকাশ করে পাঠকদের আশা পূরণ করায় আমি প্রকাশনী কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। বইটির মূল লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ পাক তাঁর অসীম রহমত নাযিল করুন এটা আমার প্রার্থনা। বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকা বইটি থেকে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

অনুবাদ কর্ম সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মূল লেখক বইটি আরবীতে লিখেছেন। প্রথমে আরবী থেকে উর্দূতে তরজমা হয়েছে। সেই উর্দূ থেকে আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ তা ধরিয়ে দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভবিষ্যতে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। আল্লাহর দরবারে আমার শুধু একটিমাত্র দোয়া, হে রাববুল আলামীন ! এই বই অনুবাদের নগণ্য খিদমতের উছিলায় তুমি আমাকে পরকালীন নাজাত দান করো ! আমিন !!

মগবাজার
শবে কদরের রাত
১৪০৮ হিজরীর রমজান মাস

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

সৃজনের প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণাগ্রন্থ

ইসলামী গবেষণার নীতি ও পদ্ধতি/ আহমদ ফন ডেনফার
মুসলিম আইনের মুখবন্ধ/ ড. আহমদ আনিসুর রহমান
ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা/ ড. ইউসুফ আল কারজাভী/
অনুবাদঃ সানাউল্লা আখুঞ্জী
Elite Ideology Across Developing Socities/
Dr. A. Rahman. Ph. D. (MIT)
বাংলা ও বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা/ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ভাষা লিপি ও সাহিত্য/ মুহম্মদ আবু তালিব

সূচী পত্র

১

দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

দারিদ্র্য এবং বুভুক্ষা প্রশ্নে ইসলামের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিন্তাধারার সাথে সংশ্লিষ্ট দলগুলো কি মত পোষণ করে তা আলোচনা করা দরকার।

দুনিয়া ত্যাগের প্রবক্তাদের মত

একটি দল রয়েছে যারা দুনিয়া ত্যাগের প্রবক্তা। তাদের ধারণা হলো, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এমন খারাপ কিছু নয়, যা দূর করার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আর এটা সমাধান করার মত সমস্যাও নয়, বরং এটা একটা নেয়ামত। আল্লাহপাক নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে এই নেয়ামত দান করেছেন যাতে পরকালের চিন্তা তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল থাকে এবং পার্থিব জগতের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে আল্লাহর স্মরণে সদা মশগুল থাকা যায়। পক্ষান্তরে সচ্ছলতা এবং বিত্ত সম্পদ এমন এক বস্তু যা মানুষকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে থাকে। এই দলের কিছু লোকের ধারণা, দুনিয়ার আপাদমস্তক ফিতনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ। সুতরাং দুনিয়াটা তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাই উত্তম অথবা নিদেনপক্ষে দুনিয়ায় মানুষের অবস্থানের মেয়াদ খুব কম হওয়াই ভালো। অতএব, বুদ্ধিমত্তার দাবী হলো, পার্থিব বিষয়াদি থেকে শুধু এতটুকুন ফায়দাই নেওয়া উচিত যাতে মানুষের জীবদ্দশায় দুনিয়াটা একদম সংকীর্ণ না হয়ে যায়। পৌত্তলিক ও আহলে কিতাবদের একটি শ্রেণীও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা এটা শারীরিক উৎপীড়নের একটা মাধ্যম। আর শারীরিক উৎপীড়ন রূহানী উন্নয়নের একটা ওসিলা। এইসব ধ্যান-ধারণা মুসলমান সূফীদের কতিপয় দলের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির সাথে বিজাতীয় অচেনা সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সময় থেকেই এইসব চিন্তাধারার প্রচলন শুরু হয়। এ ধরনের ধর্মীয় কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দরিদ্র ও বুভুক্ষকে দেখে বল, "হে নেক কাজের অনুসারীরা, মারহাবা !!" বিত্ত সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতাকে দেখে উচ্চারণ কর, "এটা একটা পাপ যার শাস্তি শীঘ্রই পাবে।"

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সম্পর্কে যাদের এই ধ্যান-ধারণা তাদের কাছ থেকে এর কোন সমাধান আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মোটকথা, তারা দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে কোন সমস্যাই মনে করে না।

জাবরিয়া

দ্বিতীয় দল হলো জাবরিয়াদের দল। তারা বলে থাকে ভিক্ষুকের করুণ অবস্থা এবং বিত্তশালীর প্রাচুর্য ও সচ্ছলতায় আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকরী থাকে। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে সবাইকে বিত্তশালী করতেন। কিন্তু তিনি কাউকে অঢেল রিজক দান করেন, আবার কাউকে খুব কম। এভাবেই তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহর এই ইচ্ছা ও নির্দেশকে কেউ টলাতে পারে না। তারা দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার যে সমাধান পেশ করে, তা হলো ভিক্ষুক ও মিসকিনদেরকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার ওপরই পরিতুষ্ট থাকার শিক্ষা নিতে হবে। কেননা অল্পে তুষ্ট থাকা এমন এক বস্তু যা ধ্বংস ও নিঃশেষ হয় না। তাদের নিকট অল্পে তুষ্ট থাকার অর্থ হলো সব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কিন্তু এই দল বিত্তশালীদের ব্যাপারে কোন মাথা ঘামায় না। তাদের কোন নসিহতও করে না। তারা শুধু ফকির মিসকিনদেরকেই উপদেশ খয়রাত করে। তারা তাদেরকে বলে, আল্লাহতায়ালা ধন-সম্পদর যেভাবে বিলি-বন্টন করেছেন তাতেই রাজী হয়ে যাও এবং আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে বেশী কিছু চেয়ো না। নিজের দারিদ্র্যাবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টাও করো না।

ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রবক্তাদের মত

যারা তৃতীয় দলভুক্ত তাদেরকে ব্যক্তিগত ইহসান বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তারা দারিদ্র্য ও দৈন্যকে একটি সমাধানযোগ্য সমস্যা হিসেবে মনে করে এবং শুধু ফকির-মিসকিনদেরকেই ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির নসিহত করে না, বরং ধনী ও বিত্তশালীদেরকেও আল্লাহতায়ালার কাছে পরকালে উত্তম প্রতিদানের কথা শুনিয়ে নিজের সম্পদ থেকে ফকির-মিসকিনদেরকে সাদকা দানের নসিহত করে থাকে। অধিকন্তু গরীব ও ফকিরদের সাথে কঠোর ব্যবহারকারীদেরকে খারাপ প্রতিফল এবং নরকের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে সম্পদের কোন নির্দিষ্ট অংশ প্রদান আবশ্যক মনে করে না যা আদায় করা

বিত্তশালীদের জন্যে ওয়াজিব। এই মতে দরিদ্রদের সাহায্য প্রশ্নে কেউ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে কোন বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট নেই এবং এমন কোন নিয়ম-কানুনও নেই যার মাধ্যমে হকদারদের কাছে সেই সাহায্য পৌছানো যায়, বরং সবকিছুই মুমিন-মুহসিনদের শুধু সন্তুষ্টির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা শুধু আল্লাহর সওয়াব এবং শাস্তির ভয়েই এই অনুকম্পা প্রদর্শন করবে। দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রদর্শনের এই মতবাদ মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল।

পুঁজিপতিদের মতবাদ

চতুর্থ দল হলো পুঁজিপতিদের। তারা বলে থাকে, 'দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা জীবনের অন্যতম খারাপ জিনিস এবং জীবন সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অবশ্যই। তবে এই খারাবির দায়-দায়িত্ব হয় সেই ফকির লোকটির অথবা এটা আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের দোষ। সমাজ অথবা রাষ্ট্র এ জন্যে দায়ী নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ব্যাপারে স্বয়ন্তর ও প্রত্যেকেই নিজের সম্পদ ব্যয় প্রশ্নে স্বাধীন। পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধনী হওয়ায় কেউ কাউকে বাধা দেয় না।

সম্পদ অর্জনের এই যুগে কেউ পেছনে পড়ে থাকলে সমাজ সেজন্যে মোটেই জিম্মাদার নয়। আর ধনীরাও তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে বাধ্য নয়। হাঁ, যদি সে মেহেরবানী করে অথবা অন্য কোন মুসলিহাতে অথবা

আখিরাতের প্রতিদানের আশায় গরীবকে সাহায্য করে, সেটা হবে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' এটা হল নীরেট পুঁজিবাদ। স্বাধীন জীবিকার দর্শনই এই মতবাদের জন্ম দেয় এবং ইউরোপে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। পশ্চিমা সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, নির্দয়তা এবং দুর্বলদের প্রতি শোষণ সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয় যার ফলে মহিলা ও শিশুরা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকে কাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। এই বন্য সমাজে যাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেজন্যেই তারা এ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিভিন্ন বিপ্লব ও বিশ্ব যুদ্ধের কারণে যখন অবস্থার কিছু পরিবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা শক্তিশালী হলো তখন জুলম-নিষ্পেষণকারী পুঁজিপতিরা নিজেদের নীতিতে ভারসাম্য সৃষ্টিতে বাধ্য হয়ে পড়লো। তারা গরীব ও পরমুখাপেক্ষীদের অধিকার স্বীকার করে নিতে শুরু করলো। এই অধিকারই পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আইনের হস্তক্ষেপে "সামষ্টিক বীমা" ও "সামষ্টিক সংরক্ষণ" নামে চিহ্নিত হয়েছে।

কম্যুনিজম

মার্কসীয় কম্যুনিজমের ঝান্ডাবাহীরা হলো পঞ্চম দলভুক্ত। তাদের ধারণা হলো , বিত্তশালী শ্রেণীকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং তাদের ধন–সম্পদ বাজেয়াপ্তের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং তাদের মনে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা–বিদ্বেষের বীজ বপণ ও শ্রেণী সংগ্রামের উস্কানী প্রদান অত্যন্ত জরুরী। তাতে প্রোলেতারিয়েত মজুর শ্রেণী বিজয় লাভ করতে পারবে। এই মতবাদের ঝন্ডাবাহীরা শুধু ধনী ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে নির্মূল করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তারা "ব্যক্তি মালিকানা" বিরোধী এবং সম্পদ সৃষ্টির সর্ব মাধ্যম, যেমন জমি, কারখানা, মেশিন প্রভৃতি সরকারী মালিকানায় প্রদানের সমর্থক। কম্যুনিষ্ট ও স্যোশালিষ্টদের মধ্যে যদিও কিছু মতবিরোধ রয়েছে, তবুও "ব্যক্তিমালিকানা"কে তারা সবাই সব অঘটনের মূল বলে মনে করে এবং ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ।

অনেকে ব্যক্তি মালিকানার মূলোচ্ছেদে গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। আবার কেউ বা শক্তি প্রয়োগ নীতিতে বিশ্বাসী। জর্জ বারগন ও পিয়ের রাম্বসের লিখিত "এই হয় কম্যুনিজম" পুস্তকে এ সম্পর্কে লিখেছেন, কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট কম্যুনিজমকে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মানুষের মর্যাদা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য অন্যরা এই উক্তির জবাব দিয়েছেন। তারা বলেছেন, কম্যুনিজমের অর্থই হলো জাতির সকল উৎপাদনের মাধ্যম করায়ত্ত করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো। ম্যাক্সিম লোরবা নিজের পুস্তক "ফরাসী কম্যুনিজমের ঝান্ডাবাহী"তে লিখেছেন, কম্যুনিজম কয়েক ভাগে বিভক্ত। বালুফের কম্যুনিজম প্রুডেনের কম্যুনিজম থেকে ভিন্ন ধরনের। মান সাইমুন এবং প্রুডেনের কম্যুনিজমের অবকাঠামো ব্লাংকের কম্যুনিজম থেকে ব্যাপক ভিন্নধর্মী। এইসব ধ্যান–ধারণা লুইস ব্লান, ফিওরবাফ ও বেকার প্রমুখের চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মোট কথা, কম্যুনিস্টদের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে দুস্তর মতভেদ বিদ্যমান। তবে ব্যক্তি মালিকানা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের ব্যাপারে তাদের মতৈক্য রয়েছে। এ কারণেই চরম মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে।

সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নেই। জীবন সম্পর্কে দু'মতবাদেরই একই ধরনের বস্তুতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বিদ্যমান। উভয় মতবাদেই ধর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। ধর্মকে তারা সমাজ থেকে পৃথক রাখারই পক্ষপাতী। উভয় মতবাদই ধর্মহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বায়ক। উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিলে দু'মতবাদেই শক্তি

প্রয়োগ এবং রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করাকে বৈধ করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উভয় মতবাদই অবস্থার পরিবর্তনে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন না করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন করে।

ইসলামের ধ্যান–ধারণা

ইসলাম দুনিয়া ত্যাগের প্রবক্তাদের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করেছে। কোরআন শরীফের কোন একটি আয়াত বা রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত কোন সহীহ হাদিসই তাদের মত সমর্থন করে না। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ সম্পর্কিত যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাকে কোনক্রমেই দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সমর্থনে পেশ করা যায় না। কেননা উদাসীনতা ও নির্মোহের সাথে বস্তুর মালিকানা সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট থাকে। বস্তু থাকলেই তার প্রতি নির্মোহের প্রশ্ন আসে। আর নির্মোহ সেই ব্যক্তিই হতে পারে যিনি বস্তুগত ধনসম্পদের অধিকারী, কিন্তু তার অন্তর ধন–সম্পদ এবং মান–মর্যাদার আসক্তি থেকে মুক্ত। ইসলাম বিত্ত–সম্পদকে আল্লাহতায়ালার নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু শর্ত হলো হালাল পন্থায় বিত্ত ও সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং সম্পদের জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইসলামে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে এমন মুসিবত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত। অতঃপর সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা দূরীকরণে বিভিন্নমুখী পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক রাসূলে (সঃ) খোদাকেও বিত্তশালী করে ইহসান করেছিলেন। এখানে এ কথাটি পেশ করাই উত্তম হবে। কোরআন মজিদে বলা হয়েছে, "ওয়া ওয়াজাদাকা য়াইলান ফা আগনা" (সেই আল্লাহ আপনাকে অভাবগ্রস্ত পেয়েছিলেন, অতপরঃ আপনাকে বিত্তশালী করে দিয়েছেন) রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ফরমান হলো, "নেককার মানুষের কাছে যে সম্পদ থাকে সেই সম্পদই উৎকৃষ্টতম সম্পদ।" নবী করিম (সঃ) থেকে বর্ণিত অনেক হাদিসেই দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে এক বড় আপদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এই দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার প্রভাবেই ব্যক্তি, সমাজ, ঈমান–আকিদা, আখলাক, ধ্যান–ধারণা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে না, নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও অভাবগ্রস্ততা মানুষের ঈমান–আকীদাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে, বিশেষ করে সেই অভাব যার চারদিকে কিছু সংখ্যক মানুষ অঢেল সম্পদের অধিকারী। বেচারা গরীব ও অভাবগ্রস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে। আর পুঁজিপতিরা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে বসে আছে। এই অবস্থায় দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা মানুষকে সৃষ্টি জগতের খোদায়ী

ব্যবস্থাপনার হিকমত এবং সম্পদের ইনসাফভিত্তিক খোদায়ী বন্টন সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

ঈমান–আকিদা থেকে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাজনিত কারণে সৃষ্ট বিচ্যুতির পটভূমিকাতেই অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, "দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা যখন কোন এলাকার দিকে ধাবিত হয় তখন কুফর তাকে তার সাথে নিয়ে যেতে বলে।" রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেন, "দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা কুফুরীর নিকটবর্তী করে ফেলে।" তাঁর এইসব দোয়াও প্রকাশ করে যে, চরম দারিদ্র্য বাস্তবিকই কুফর এবং গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি দোয়া করেছেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি" ––হে আল্লাহ! আমি কুফর, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা থেকে অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই। "আল্লাহুম্মা ইন্নি আইযুবিকা মিনাল ফাকরি ওয়াল কিল্লাতী ওয়াজজিল্লাতি।" ––হে আল্লাহ্ ! আমি দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা, সম্পদের কমতি এবং জিল্লতি থেকে অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই।

চরিত্র ও চাল–চলনের ক্ষেত্রেও দারিদ্র্য কম ভয়াবহ নয়। কোন গরীব ও অভাবগ্রস্তকে তার খারাপ অবস্থা এবং বঞ্চনা অনেক দ্বীনী এবং পার্থিব ব্যাপারে অমর্যাদাকর ও নীচতা অবলম্বনে বাধ্য করে। এ জন্যেই তো বলা হয় যে, পেটের টান অন্তরের টানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। এর থেকেও খারাপ কথা হলো, বঞ্চনা স্বয়ং চারিত্রিক মর্যাদা সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। নবী করিম (সঃ) দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার চাপের কঠোরতা এবং চালচলনের ওপর তার প্রভাব ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "উপহার যতক্ষণ উপহার থাকে ততক্ষণ গ্রহণ কর। যখন উপহার দ্বীনের বিরুদ্ধে ঘুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হয় তখন তা কখনো গ্রহণ করবে না। কিন্তু তোমাদেরকে তা ছাড়তে দেখা যায় না, কেননা প্রয়োজন ও অভাবগ্রস্ততা তোমাদেরকে তা ছাড়া থেকে বিরত রাখে (আততিবরাণী)।

একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির চরিত্রের ওপর ঋণ কি ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে ? এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে তখন সে মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা খেলাফী করে থাকে।" (আল বুখারি) দারিদ্র্য ও বৈভব এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী ও দুশ্চরিত্রের মধ্যে কি সম্পর্ক তা তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যেই প্রস্ফুটিত। এক ব্যক্তি রাতের বেলায় ছাদকা করলো। ঘটনাক্রমে সেই ছাদকা একজন চোর পেল। লোকজন এজন্যে কানাঘুষা শুরু করলো। অতঃপর সেই ব্যক্তি একজন মহিলাকে ছাদকা দিল। ঘটনাক্রমে মহিলা জিনাকার হিসেবে প্রমাণিত হলো। লোকজন আবারো কানাঘুষা শুরু করলো। তারা বললোঃ লোকটি আজ

রাতে একজন জিনাকার মহিলাকে ছাদকা দিয়েছে। ছাদকাদানকারী ব্যক্তিকে এক রাতে স্বপ্নে এক ব্যক্তি বললো, "তুমি চোরকে যে ছাদকা দিয়েছ, হতে পারে এই ছাদকা তাকে চুরির কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। আর জিনাকার মহিলাকে ছাদকা দানের কারণে সে জিনা থেকে বিরত থাকতে পারে।" (আল বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)। এ থেকে পরিষ্কার হয় যে, সম্পদ এসে যাওয়ার পর চোর চুরি থেকে এবং জিনাকার মহিলা জিনা থেকে বিরত থাকতে পারে।

মানুষের ঈমান-আকীদা, চরিত্র ও চাল-চলন ছাড়াও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। একজন অভাবগ্রস্ত মানুষ যার নিজের পরিবার-পরিজনের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিষ আয়ত্তে নেই, সে কি করে গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে? ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান সাইবানীর প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি হলোঃ এক মজলিসে তার চাকরানী উপস্থিত হলো এবং তাকে ঘরে আটা শেষ হয়ে যাওয়ার খবর দিল। তিনি চাকরানীকে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক! তুমি আমার মস্তিষ্ক থেকে ফিকাহর ৪০টি মাসায়ালা নষ্ট করে দিয়েছ।" ইমাম আযম বলেছেন, "যার ঘরে খাবার নেই তার কাছে পরামর্শ চেয়ো না। কেননা সে চিন্তাক্লিষ্ট থাকে। তার সিদ্ধান্ত ঠিক হয় না।" মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এটা সত্য যে, কোন গভীর আবেগ মানুষের সুষ্ঠু চিন্তা এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তের ওপর অবশ্যই প্রভাব ফেলে থাকে। একটি সহীহ হাদিসেও বর্ণিত আছে যে, রাগ বা ক্রোধের সময় বিচারকের অবশ্যই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। এই হাদিসের উপর কিয়াস করে ফকিহরা ক্ষুৎ-পিপাসার কঠোরতাকেও একই পর্যায়ে ফেলেছেন।

দারিদ্র্য পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রেও মারাত্মক। পারিবারিক জীবন গঠনে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সবচেয়ে বড় বাধা। বিবাহ, মহরানা ও খোরপোশের দায়িত্ব পালনে দারিদ্র্য সবসময় বিপত্তি সৃষ্টি করে। এজন্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর যুবকদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য এবং পবিত্রতার রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন" (আন-নূরঃ ৩৩)।

কিছু যুবতী এবং তার অভিভাবকেরা গরীব ও সম্পদহীন লোকের সাথে বিয়ে বসা এবং দেওয়ায় দ্বিধা করে না। এটা একটা পুরাতন রোগ। কোরআন এ সম্পর্কে নোটিশ দিয়েছে এবং পিতা-মাতাকে নসিহত করেছে। নসিহতে বলা হয়েছে যে, তারা

নিজের সন্তান-সন্ততির আত্মীয়তা তালাশে নিজের মান বা মাপকাঠি পরিবর্তন করবে এবং শুধু ধন-সম্পদের পরিবর্তে নেকী ও মঙ্গলকেই মৌলিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহপাক বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান -তাদের বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয় তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততা বিধানকারী এবং মহাবিজ্ঞ।" (আন নূরঃ ৩২)

কোন কোন সময় দারিদ্র্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা বেশীর ভাগ সময়ই একই গোত্রের লোকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে চির ধরায়। এমনকি তাদের বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। আরবের জাহেলী যুগে কিছু পিতা-মাতা দরিদ্র্যতার কারণে বাধ্য হয়ে অথবা ভবিষ্যত দরিদ্র্যতার ভয়ে নিজের কলিজার টুকরো সন্তানদেরকে মেরে ফেলতো। কোরআন মজিদে এই ধরনের পিতা-মাতাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, "নিজের সন্তান-সন্ততিকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরাই তোমাকে এবং তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি।" (আল আনয়ামঃ ১৫১) "দারিদ্র্যের ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। আমরাই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি। তাদের হত্যা করা অবশ্যই গুনাহের কাজ।" (বনি ইসরাইলঃ ৩১)।

নবী করিম (সঃ) সন্তান হত্যাকে শিরকের পর সবচে বড় গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি?" তিনি বলেছেন, "কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা বা অংশীদার ঠাওরানো। অথচ তোমাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞাসা করা হলো, "এরপর কোন্‌টি?" তিনি ফরমালেন, "সাথে খাওয়ার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা।"

এ থেকে জানা গেল যে, ইসলাম মানবীয় চালচলনের ওপর অর্থনৈতিক কারণসমূহের প্রভাব মেনে নিয়েছে। এমনকি এইসব কারণ অনেক সময় মানুষের প্রাকৃতিক আবেগকেও ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি নিজের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করে সে অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হয়ে পিতৃস্নেহের আবেগকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু এমন ধরনের উদাহরণ প্রতিটি স্থান, প্রতি যুগ ও অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির চাল-চলনের মানদন্ড হিসেবে নির্ণয় করা যায় না। মানবিক চালচলন ভালো অথবা মন্দ হওয়ার প্রশ্নে নিঃসন্দেহে অন্যান্য কারণও কার্যকর থাকে।

যেমন মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয়, চারিত্রিক এবং সামষ্টিক কারণসমূহকেও উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এখানে আমরা শুধু সেই কারণকেই আলোচনার অর্ন্তভুক্ত করেছি যা শুধু জাহেলী ও বেওকুফীর কারণে মানুষ নিজের সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য হয়।

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ানক অন্তরায়। হজরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তির ঘরে খাওয়ার খোরাক নেই সে কেন নিজের তলোয়ার বের করে জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে না এ ব্যাপারে আমি হয়রান হয়ে যাই।" মানুষ দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে যতক্ষণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি থাকে। কিন্তু সম্পদের ভুল বন্টন নীতি এবং বিত্তবানরা গরীবদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে এবং সংখ্যাধিক্যের স্বার্থকে উপেক্ষা করে সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয়রা ভোগ–বিলাসে ও আনন্দে মেতে ওঠে তখন গরীব শ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার কারণে অশান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক ঐক্য ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

দারিদ্র্য কোন জাতির নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নেও মারাত্মক বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। একজন গরীব ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির অন্তরে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতিরক্ষার আবেগ ও উদ্দীপনা কোনক্রমেই সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা তার দেশ তার ক্ষুধা দূর করে না এবং তার জাতি তার দারিদ্র্য ও দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে না। এটা কেমন করে হতে পারে যে, জাতি ও দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এক গরীবের ওপর ন্যস্ত করা হবে এবং অন্যেরা ভোগ–বিলাসের জীবন যাপন করবে? এ ছাড়া দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানসিক সুস্থতার ওপরও প্রভাব ফেলে স্বভাবে নীচতা, খিটমেটেপনা ও ক্রোধ প্রকাশ পায়। ফলে তার কর্মশক্তি কমে যায় এবং সামাজিকভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

জাবরিয়াত চিন্তাধারা ও ইসলাম

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার প্রশ্নে জাবরিয়াতপন্থীদের ধ্যান–ধারণার মত ইসলাম সংসারত্যাগীদের ধ্যান–ধারণারও বাতিল ঘোষণা করে। জাবরিয়া ধারণা অনুযায়ী বিত্তশালীরা যেহেতু খোদার মর্জি অনুযায়ীই বিত্তশালী এবং ভিক্ষুকও তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী দারিদ্র্যের জীবন কাটাচ্ছে, সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই প্রতি অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করা যাবে না।

জাবরিয়াদের এই ধ্যান-ধারণা পরিস্থিতি সংশোধনের প্রতিটি প্রচেষ্টায় প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করে। তাদের চিন্তাধারা বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে জুলুম নির্যাতন খতম করে কাংখিত সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। অথচ ইনসাফপূর্ণ সমাজই মানব জীবনের হেফাজত ও অস্তিত্বের জন্য একমাত্র প্রয়োজন। বিত্তশালী শ্রেণী এই মতবাদকে নিজেদের খারাপ বাসনা চরিতার্থে লালন করে থাকে। ভিক্ষুক ও দরিদ্র শুধুমাত্র অজ্ঞতা ও ধোকার কারণে তা গ্রহণ করে।

কুরআন নাজিলের সময়ও এই মতবাদের অস্তিত্ব তৎকালীন সমাজে ছিল এবং কুরআন মজিদ মতবাদটিকে সরাসরি গোমরাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ফরমান হলোঃ "আর তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যে রিযিক তোমাদেরকে দান করেছেন তা থেকে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় কর তখন কাফের লোকেরা ঈমানদার লোকদেরকে জওয়াব দেয় ঃ আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো একবারেই গোল্লায় গিয়েছ।" (ইয়াসিনঃ ৪৭)।

বাস্তবিকই এর চেয়ে বড় গোমরাহী আর কি হতে পারে যে, স্বার্থপর লোক আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের অন্ধ নফসের কামনা-বাসনা পূরণার্থে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করবে। তাদের মতে আল্লাহ যদি কোন অভাবী লোককে খাওয়াতে চান তাহলে তার জন্যে আকাশ থেকে রুটি ও তরকারি অথবা ঘি ও মধু নিক্ষেপ করতেন। যদি তারা জ্ঞান ও ইনসাফের অধিকারী হতো তাহলে তারা বুঝতো যে, আল্লাহ মানুষদেরকে একে অপরের সাহায্যে রিযিক দিয়ে থাকেন। একজন মর্যাদাশালী ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করে তাহলে সে বাস্তবিকই আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা করে থাকে।

এই সৃষ্টি জগতে যত বড় জটিল সমস্যারই উদ্ভব হোক না কেন, তার সমাধানও রয়েছে বলেই ইসলাম আমাদেরকে পথনির্দেশ করে থাকে। যে সত্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি রোগও সৃষ্টি করেছেন। যিনি অসুখ সৃষ্টি করেছেন তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। অসুখবিসুখ ও চিকিৎসা আল্লাহর নির্ধারিত তকদির অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং একজন সাচ্চা মু'মিন তাকদিরে ইলাহির সাহায্যেই তাকদিরে ইলাহির পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। যেমন ক্ষুধাকে খাদ্য এবং পিপাসাকে পানি প্রভৃতি দিয়ে দূর করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) যখন মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিজের সাথীদের নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁকে বলা হলো, "হে আমিরুল মুমিনীন! তাকদিরে ইলাহী থেকে ভাগতে চেয়েছেন।" তিনি জবাবে বললেন, "হাঁ

আমরা তাকদিরে ইলাহি দিয়েই তাকদিরে ইলাহির দিকে ভেগে থাকি।" এই ঘটনার পূর্বে একবার নবী করিম (সঃ)কে ওষুধ ও তাবিজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিলঃ তাবিজ অথবা ওষুধ কি তাকদিরে ইলাহিকে টলাতে পারে? তিনি ফরমিয়েছিলেন, "এটাও ত তাকদিরে ইলাহি।" বস্তুত দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা যখন এক ধরনের রোগ তখন আল্লাহ তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। দারিদ্র্য যদি তাকদিরে ইলাহি হয়ে থাকে তাহলে তার মুকাবিলা করা এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও তাকদিরে ইলাহি।

অল্পে তুষ্টির তাৎপর্য

অল্পে তুষ্ট এবং সবসময় সন্তুষ্ট থাকার উৎসাহ দান সম্পর্কিত হাদিসসমূহের নির্গলিতার্থ এটা নয় যে, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ অপমান এবং অসম্মানজনক জিন্দেগীর ওপরই রাজী থাকবে। তার অর্থ এও নয় যে, সে হালাল সম্পদ, সচ্ছলতা ও আয়েশের জীবন লাভের জন্যে কোনরকম প্রচেষ্টাই চালাবে না। বিত্তশালীরা আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে এবং সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করবে --এ ধরনের অর্থ ঐ সব হাদিসের নয়।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় তাকওয়ার সাথে সাথে সচ্ছলতাও কামনা করতেন। তিনি নিজের খাদেম হযরত আনাস (রাঃ)এর জন্যে এই দোয়া করতেনঃ "আল্লাহুম্মা তাকসির মালাহু" –হে আল্লাহ ! তুমি তাকে অঢেল সম্পদ দাও। নিজের সাথী হযরত আবু বকরের তারিফ করতে গিয়ে নবী (সঃ) বলেছিলেন, "মানাফায়া'নি মালুন কামালি আবি বকরি" অর্থাৎ আবু বকর (রঃ)এর সম্পদের মত অন্য কারোর সম্পদ আমার উপকারে আসেনি। হযরত রাসূলে করিম (সঃ)এর এইসব বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে অল্পে তুষ্ট থাকার কি অর্থ হতে পারে? আমাদের ধারণায় নীচের দু'টি কথাই হলো অল্পে তুষ্ট থাকার প্রকৃত অর্থ।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে লোভী ও বস্তুর প্রতি লালায়িত। দুনিয়ার ধন-সম্পদে তার কখনই আসুদা পূরণ হয় না। নবীর হাদীসে মানুষের এই অবস্থাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "বনি আদম যদি স্বর্ণে মোড়ানো দুটি প্রান্তর পায় তাহলে সে তৃতীয়টির আকাংখা করবে। যদি তৃতীয়টিও পেয়ে যায় তাহলে সে চতুর্থ আর একটির আশা করবে। বনি আদমের পেটতো শুধু মাটিই ভরতে পারে।" (অর্থাৎ মাটির তলে যাবার পরই লোভ-লালসার এই ধারা শেষ হতে পারে)। দ্বীনের কাজ হলো মানুষের ধন-সম্পদ অর্জনের পথে ভারসাম্য সৃষ্টি করা এবং রিযিক আহরণে হালাল মাধ্যম

অবলম্বনে পথ প্রদর্শন করা। দ্বীনই মানব জীবনে এক সামঞ্জস্য বিধান এবং শান্তির দিকে পরিচালনা করে। দ্বীন মানুষকে বাড়াবাড়ি থেকে মাহফুজ রাখে। আর এই বাড়াবাড়িই শরীর ও আত্মাকে দুর্বল করে ফেলে। এজন্যই নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেনঃ "জিবরাইল (আঃ) আমার অন্তরে এ কথা অবতীর্ণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত কখনই মরে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার দানাপানি পূর্ণ না হয়। অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং রিযিক অন্বেষণে হালাল মাধ্যম অবলম্বন কর।"

মানুষকে যদি লোভ–লালসার আকর্ষণের প্রতি বাধ্য থাকার প্রশ্নে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় তাহলে সে শুধু নিজের জন্যই নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্যেই এক স্থায়ী ভীতি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যে মানব প্রকৃতিকে উচুঁ মর্যাদা, স্থায়ী তাৎপর্যসমূহ এবং চিরস্থায়ী রিযিকের দিকে মোড় পরিবর্তন করানো আবশ্যিক কাজ। আর এই কাজ শুধু দ্বীনই করতে পারে। আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেনঃ

"আর চোখ তুলেও দেখো না দুনিয়ার জীবনের সেই জাঁকজমক যা আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে দিয়েছি। এ তো আমি দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। তোমার আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী।" (তাহাঃ১৩১)

মানুষের জন্যে তাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ–রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ায় সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত ভাল আশ্রয় তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। বল, আমি কি তোমাদের বলব এ–সবের চেয়ে অধিক ভালো জিনিস কোন্‌টি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট বাগিচা রয়েছে যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। (আল ইমরানঃ ১৪–১৫)

ঈমানের কাজ হলো অন্তরে দ্বীনের স্থায়ী মর্যাদা বহাল রাখার জন্যে আখিরাত ও চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। ঈমান মুমিনকে এ শিক্ষাও দেবে যে, ঐশ্বর্য ধন–সম্পদের আধিক্যের মধ্যে নেই, বরং অন্তরের ঐশ্বর্যই বড় ঐশ্বর্য। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "অন্তরের ঐশ্বর্যই বড় ঐশ্বর্য। সম্পদের আধিক্যের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

অল্পে তুষ্ট এবং আল্লাহর ধন সম্পদ বন্টনে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো, মানুষের রিযিককে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান পারস্পরিক বেশী যোগ্যতা প্রকাশের

মতই। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান বাস্তব জগতের প্রকৃতি ও মেজাজই দাবী করে এবং এতেই মানুষের কাজ ও দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয। উপরন্তু আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছা ও স্বাধীনতার শক্তি প্রদান করে তাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। আল্লাহরও ইচ্ছা মানুষের মধ্যে এই মর্যাদার তারতম্য বিদ্যমান থাকুক। তিনি এরশাদ করেনঃ "আরো লক্ষ্য কর, আল্লাহতা'য়ালা তোমাদের মধ্যে কতককে অপর কতকের ওপর রিযিকের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।" (আন–নাহালঃ ৭১)

"তোমার আল্লাহ্ যার জন্য চান রিযক প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাহদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন।" (বনি ইসরাইলঃ ৩০)

"তিনিই তোমাদেরকে জমিনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোন লোককে অপর কোন কোন লোকের মোকাবিলায় অধিক মর্যাদা দান করেছেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন। (আল–আনআমঃ ১৬৫)

যেমন মানুষের মধ্যে কেউ বা বেঁটে, আবার কেউ বা লম্বা আকৃতির, কেউ বা কুশ্রী, আবার কেউ বা সুদর্শন, কারো মেধা শক্তি প্রখর, কারো ভোঁতা, কেউ দুর্বল এবং কেউ শক্তিশালী। এমনিভাবে কেউ গরীব এবং কেউ বিত্তশালী। এটা জীবনের মেজাজ ও প্রকৃতি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আর এইটাই আল্লাহর সুন্নাত। কম্যুনিস্টরা একে কখনো বদলাতে পারে না। এ সত্ত্বেও তারা মানুষের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভেদাভেদ খতম করে দেওয়ার ব্যাপারে লম্বা লম্বা বুলি আউড়িয়ে থাকে।

ইসলামের অল্পে তুষ্ট থাকার শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইসলামের উদ্দেশ্যই হলো মুসলমানকে বাস্তবধর্মী করে গড়ে তোলা। নিজে যে ধরনের, জীবনকেও সে সেই ধরনেরই বুঝবে। কোন মিথ্যা ধ্যান–ধারণায় পড়ে সে যেন নিজের জীবনকে দুঃখ–মুসিবতের নিগড়ে আপতিত না করে। এ ছাড়াও ইসলাম চায় মুসলমান অন্যের ধন–সম্পদের দিকে শত্রুতা পোষণকারীর দৃষ্টিতে দেখবে না। যার অন্তর শত্রুতার আগুনে প্রজ্জ্বলিত, মন দুশমনি ও অবজ্ঞার আবেগে ভরপুর এবং যার অন্তর লোভ–লালসায় পরিপূর্ণ সে যদি অন্যের ধন–সম্পদের প্রতি শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে সে দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করে নিয়ে এসে থাকে। এটাই উত্তম যে, মানুষ তার ওপর বর্ষিত নিয়ামতসমূহের প্রতিই প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক। অতঃপর নিজের

চেয়ে কম ভাগ্যবান মানুষের দিকে দৃষ্টি দিক যারা তার মত নিয়ামত লাভ করেনি। তাতে সে খুশী এবং তৃপ্তি লাভের সাথে আত্মিক শান্তিও পাবে।

অল্পে তুষ্টির অর্থ হলো মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং যা তার নাগালের বাইরে তা পেতে চাইবে না, সেই জিনিসের ওপরও সে দৃষ্টি দেবে না যা অপরকে প্রদান করা হয়েছে। নাগালের বাইরের জিনিস পাওয়ার আকাংখা ঠিক এমন ধরনের ব্যাপার যেমন অশীতিপর বৃদ্ধ যৌবনের আশা করে অথবা কোন কুশ্রী মহিলা যেমন সুশ্রী মহিলার প্রতি হিংসার দৃষ্টিতে দেখে থাকে অথবা কোন বামন কোন দীর্ঘাকৃতির মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষের নজরে দেখে। এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নবী করিম (সঃ)-এর যুগে কিছু মহিলা পুরুষকে প্রদত্ত অধিকারের মত অধিকার প্রাপ্তির আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ পাক নীচের আয়াত নাজিল করেন ঃ

"আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবিলায় যা কিছু বেশী দান করেছেন তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে।" (নিসাঃ ৩২)

দারিদ্র্যাবস্থায় বহু লোক সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ দুর্ভিক্ষে সৃষ্ট হাঙ্গামাপুর্ণ শূন্যতায় জাতিসমূহ সংকটাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। যেসব দেশ ও রাষ্ট্রে জনকল্যাণের জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা থাকে এবং মানুষের নিজের রিযিক বৃদ্ধির মাধ্যম থাকে না, এ ধরনের মানুষের সবারই অল্পে তুষ্ট থাকা সংকট নিরসনের এক কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। কেননা অসম্ভব বস্তু হাসিলের আকাংখা এবং অহেতুক লোভ-লালসা মানব প্রকৃতিকে দুঃখ-দুর্দশার দিকেই ঠেলে দেয়। যেমন লোভাতুর ব্যক্তির এটা জানা এবং আস্থা স্থাপন আবশ্যিক যে, সচ্ছলতা বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামের আধিক্যের মধ্যে নয় বরং এটা মানুষের অন্তরের বস্তু। হাদিস শরীফে এসেছেঃ বস্তুগত ধন-সম্পদ এবং সাজ-সরঞ্জামের খোদায়ী বন্টনের ওপর রাজী হয়ে যাও। তাহলে তুমি বিত্তশালী মানুষ হয়ে যাবে।

অন্য এক হাদিসে নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে ও তার কাছে জীবিকা নির্বাহের রুজী আছে এবং সে তাতেই রাজী হয়ে গেছে (অল্পে তুষ্ট হয়ে গেছে) তাহলে অবশ্যই সে সফল হয়েছে।" প্রয়োজন মাফিক অল্প

বস্তুই সেই বেশী বস্তু থেকে ভালো যা অনেক বেশী কিন্তু মানুষকে গাফলতিতে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ পাক বলেন, "যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক কি নারী, যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাবো।" (নহলঃ ৯৭)। হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতের পবিত্র জীবন যাপনকে 'অল্পে তুষ্ট থাকার জীবন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যক্তিগত অনুগ্রহের ইসলামী মতবাদ

ইসলাম বিত্তশালীদেরকে সাদকা ও খয়রাতের আহ্বান জানানো, দুর্বলদের কষ্ট লাঘবে আগুয়ান হওয়া এবং দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাপীড়িত লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারণে উৎসাহ দেওয়ার প্রশ্নে তৃতীয় গ্রুপ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইহসান প্রদর্শনের মতাবলম্বীদের সমমনা বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলাম এই মতের মোটেই প্রবক্তা নয় যে, শুধু ব্যক্তিগত সাদকা ও অনুগ্রহের ওপর সীমাবদ্ধ থেকে সমাজের দরিদ্র ও অক্ষম লোকদেরকে বিত্তশালীদের রহমত ও দয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, বিশেষ করে অন্তর কঠিন এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার সময়ও অন্তরে ও চিন্তায় লোভ–লালসার আধিক্য হলে সর্বোপরি মালদারের কাছে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের চেয়ে মালের কদর বেশী হলে ব্যক্তিগত ইহসান বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। জাহেলী যুগের সমাজের অবস্থা এই পর্যায়েই পৌছেছিল। কোরআন মজীদে সেই চিত্রকে এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

"কখনও নয়, বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না এবং গরীব মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্যে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। মীরাসের সব মাল সম্যক্‌ভাবে খেয়ে ফেল। ধনসম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর।" (ফজরঃ ১৮, ১৯, ২০)

ডঃ ইবরাহিম লুবান গরীব ও অক্ষমদের অধিকারের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত ইহসান বা অনুগ্রহকে এভাবে পর্যালোচনা করেছেনঃ "ব্যক্তিগত ইহসানের ধারণা একটি প্রাচীনতম মাধ্যম। সব আসমানী ধর্ম সমাজের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে এই মাধ্যম ব্যবহার করে আসছে। মানবতা দারিদ্র্যের মোকাবিলা এবং ফকির–মিসকিনের সাহায্যার্থে দীর্ঘদিন যাবৎ এর ওপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এটাও বাস্তব যে, এই ব্যক্তিগত ইহসানের মধ্যে অসংখ্য গুণ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারেনি এবং গরীব ও অক্ষমদের জীবন এমন মর্যাদায় সমাসীন করতে পারেনি যাকে সম্ভ্রমপূর্ণ মানব জীবন বলা যায়। ইত্যবসরে আমাদেরকে

ব্যক্তিগত ইহসানের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং তার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তাতে ব্যক্তিগত ইহসানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দোষ থেকে সমাজকে পবিত্রকরণের ব্যর্থতার চিত্র ভেসে উঠবে।

জীবনে করণীয় কর্তব্যসমূহ সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক হলো ফরজ কাজ। দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত অধিকার। কোন বিক্রিত বস্তু অথবা ক্রীত বস্তুর মূল্য ক্রয়কারীর ওপর আদায় করা ফরজ। মূল্যের কথা পৃথক ব্যাপার। বিক্রয়কারীর মূল্য দাবী করা হলো অধিকার এবং নিম্নের দু'টি কারণ তার সেই অধিকারকে শক্তিশালী করে।

প্রথমত, তার অধিকারের পেছনে মূল্য দাবীর বস্তু মওজুদ থাকে। যে বস্তু এই মূল্য দাবী করতে পারে এবং তা নষ্ট হওয়া অথবা উপেক্ষা করা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন সরকার নিজের দায়িত্ব মনে করে যে, অধিকারের দাবীদারকে তার অধিকার দিতে হবে।

আমরা সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে সফলতার জামিন হলো ফরজ আদায়ের ধ্যান-ধারণার সাথে হকদারকে হক প্রদানের চিন্তা-ভাবনাও থাকতে হবে। অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে শুধু ফরজ আদায়ের ধ্যান-ধারণাই সাফল্যের জামিন হতে পারে না।

অবশ্য করণীয় কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া ব্যক্তিগত ইহসানের ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার। ব্যক্তিগত ইহসানকে অধিকাংশ লোক দাতার ফরজ মনে করে। কিন্তু গ্রহণকারী অধিকার বলে মনে করে না। এজন্যে যে যুগে ব্যক্তিগত ইহসানের ধ্যান-ধারণার প্রচলন ছিল, সে যুগে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্ররা চিন্তাই করতে পারতো না যে, তাদের ওপরও মালদালদের হক রয়েছে-- যে হক তারা দাবী করতে পারে। সুতরাং বহু সংখ্যক মালদার মানুষ এই হককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতো। ফকির ও মিসকিনরা নিজেদের অধিকার দাবী করতে পারে অথবা সমকালীন সরকার তাদের অধিকার পৌছে দেবেন।

উল্লিখিত আলোচনায় এই কথাও সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত ইহসানে সেই জরুরী শর্ত মজুদ নেই যা সমকালীন সরকারের জন্য হস্তক্ষেপ জরুরী হয়। সরকার সুস্পষ্ট শর্তের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ট্যাক্স হিসেবে আদায় করে থাকেন। কিন্তু সরকার ব্যক্তিগত ইহসান আদায় করে দিতে পারেন না। কেননা তাতে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই এবং এ কথাও স্পষ্ট নেই যে, কার ওপর ব্যক্তিগত ইহসান ওয়াজিব এবং কখন ওয়াজিব হয়? এমনিভাবে ব্যক্তিগত ইহসানের মর্যাদা শুধু

ফরজের মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। এই ফরজের এমন শক্তি ছিলো না, যা গরীব ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার বলা যায়। কেননা তার কোন পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না এবং সমকালীন সরকার তা জমা করে অধিকারপ্রাপ্তদের মধ্যে বন্টন করারও অধিকার রাখতো না। বিত্তশালীরা যদি নিজেরা দায়িত্ব মনে করে গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতো তাহলেই যথেষ্ট হয়ে যেত। নচেৎ নয়। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সম্পদের ওপর লোভ করে থাকে এবং তা খরচ করতে দ্বিধা করে। পরিণামফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, মানুষ আস্তে আস্তে ব্যক্তিগত ইহসান ছেড়েই দিয়েছিল। তাতে গরীব ও মিসকিনরা চরম অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। এ সত্ত্বেও সামগ্রিক ব্যবস্থায় তাদের দেখাশোনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ইহসানকে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যার কোন পূর্ণ সমাধান বলা যায় না।

২

পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম ও ইসলাম

ইসলাম পুঁজিবাদ ধ্যান–ধারণার বিরোধী

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যার সমাধানে ইসলাম যেমন ব্যক্তিগত ইহসানের ওপর নির্ভরশীলতা সমর্থন করে না, তেমনি পুঁজিবাদী ধারণারও বিরোধিতা করে। ইসলাম এ কথা সমর্থন করে না যে, কোন বিত্তবান ব্যক্তি নিজের ধন–সম্পদের প্রকৃত মালিক এবং সেই সম্পদ ব্যয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। চাইলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলো এবং চাইলে কৃপণতা করলো অথবা নিজের নফসের চাহিদা পূরণের জন্যে অন্যায়ভাবে সম্পদ ব্যয় করতে থাকলো। সাধারণত একে পুঁজিবাদী ধ্যান–ধারণা বলা হয়, বরং একে কারুনী ধ্যান–ধারণা বলাই সঙ্গত। কারুন নিজের বিত্ত–বৈভবকে নিজের পূর্ণতা বলতো এবং আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি জানাতো। সে স্বজাতির অধিকার মেরে খেত। এই কারণেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত তাকে এবং তার ধন–সম্পদকে মাটিতে পুঁতেদিয়েছিলেন।

সূরায়ে কাসাসে আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেনঃ "শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে যমীনে পুঁতে ফেললাম। পরে তার সাহায্যকারী আর কেউ ছিল না যে, আল্লাহর মোকাবেলায় তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসল আর না সে নিজে, নিজের কোন সাহায্য করতে পেরেছে।" (সূরায়ে আল–কাসাসঃ ৮১)

ধন–সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের চিন্তাধারা হলো, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। বিত্তশালী ব্যক্তি সম্পদের অধিকার ও ব্যয়ের প্রশ্নে তার আমানতদার। তাকে সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে প্রকৃত মালিকের মর্জি ও ইচ্ছার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "এবং ব্যয় কর সেই সব জিনিস থেকে যে সবের ওপর তিনি তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন।" (হাদীদঃ) "আল্লাহ যে সম্পদ তোমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও (আন–নূরঃ ৩৩) "যেসব ধন–সম্পদ আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ কর।" (আল্ বাকারাহঃ ২৫৪)

যাকাতের ইসলামী বিধান

বস্তুত সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। এ জন্যে তিনি বিত্তশালীদেরকে নিজের ধন–সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে গরীব–মিসকিনদের হক হিসেবে রাখাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইসলাম শুধু ওয়াজ–নসিহত এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলক কথাকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং সে ইসলামী রাষ্ট্রকে এই অধিকার প্রদান করে যে, ইসলামী রাষ্ট্র বিত্তশালীদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নির্ধারিত হক আদায় করে গরীব–মিসকিনদেরকে প্রদান করবে এবং যে আল্লাহ্র এই বিধানকে অমান্য করবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। নিরুপায় হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই অধিকারের সামনে মাথা নত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে। ইসলাম ওয়াজ–নসিহতের সাথে সাথে রাষ্ট্র ও আইনের চাপও প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবক্তারা শুধু ওয়াজ–নসিহত করাকেই যথেষ্ট মনে করে।

এই বিধানের পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যান্য মতবাদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক করেছে। এছাড়া ইসলামী চিন্তাধারার নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলী অন্যান্য মতবাদে পাওয়া যায় না।

১– কালের প্রাধান্য

ইসলাম চৌদ্দ শ' বছর থেকে ফকির, মিসকিন ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার মেনে নিয়েছে এবং তা আদায়ে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কোন ভালো কাজের শুরুই তো প্রশংসার দাবীদার।

২– অটলতা ও স্থায়িত্ব

মানুষের সৃষ্ট জীবন ব্যবস্থায় জরুরী অবস্থার মধ্যে কতিপয় বিধান তৈরী করা হয় এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই সব বিধান বাতিলও করা যায়। কিন্তু ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত স্থায়ী বিধান। এই বিধান অটল। এর পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৩– সামগ্রিকতা

এই বৈশিষ্ট্য সেই বিধানেই পাওয়া সম্ভব যে বিধানের প্রণেতা মানুষ এবং সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তিনি তাঁর সৃষ্টির রহস্য সর্ম্পকেও পরিজ্ঞাত। এই বৈশিষ্ট্য সেই বিধানেই পাওয়া সম্ভব যে বিধান মানবিক দুর্বলতা এবং কামনা–

বাসনা থেকে পবিত্র। কেননা মানবিক আশা–আকাংখা বিভিন্ন ব্যাপারে মানুষের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৪– মৌলিকত্ব

ইসলাম ফকির–মিসকিনদের যে অধিকার নির্ধারণ করেছে এবং সেজন্যে যেসব বিধান প্রণয়ন করেছে তা কোন বিশেষ অবস্থা, বিপ্লব ও যুদ্ধ বিগ্রহের চাপে করেনি, বরং তা ইসলামের মৌলিক বিধান।

বর্তমান যুগে জীবন বীমা পদ্ধতি চালু রয়েছে। পলিসি হোল্ডারদের আদায়কৃত কিস্তির ভিত্তিতে বিনিময় প্রদানের নীতিতে জীবন বীমা গঠিত হয়ে থাকে। এতে পলিসি হোল্ডারের জীবনের প্রকৃত আবশ্যকতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না অর্থাৎ যে বেশী পরিমাণ আদায় করবে সে বেশী পাবে এবং যে কম আদায় করবে সে সেই অনুপাতেই পাবে। তার প্রয়োজন যত বেশীই থাকুক না কেন সেদিকে নজর দেওয়া আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে ইসলাম সামষ্টিক ইন্সিওরেন্সের প্রবক্তা। ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন অভাবগ্রস্তকে ততটুকু দিতে হবে যা দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ হয় এবং তার দুঃখ ও অভাব দূর হয়। এমনিভাবে পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক নিরাপত্তা স্কীমও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে অক্ষম। তার দুটি কারণ রয়েছে।

১– এই ব্যবস্থায় সেই সামগ্রিকতা নেই যা সমাজের সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির হেফাজতের জামিন হতে পারে।

২– এই ব্যবস্থা অভাবগ্রস্তদের পুরো হেফাজত করতেও সক্ষম নয়। অন্যদিকে ইসলামের একটি বিধান রয়েছে যা যাকাত বিধান নামে পরিচিত। এই বিধানের মাধ্যমে গরীব–মিসকিনদের প্রতিপালন সুন্দরভাবে করা সম্ভব।

ইসলাম ও কম্যুনিজমের পার্থক্য

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা প্রশ্নে ইসলাম যেমন বৈরাগ্য, জাবরিয়া এবং ব্যক্তিগত ইহসানের প্রবক্তাদের ও পুঁজিপতিদের চিন্তধারাকে বাতিল করে দেয় তেমনি মার্কসীয় কম্যুনিজমকেও জোরের সাথেই নাকচ করে। কম্যুনিজম সমর্থকদের কাছে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হলো বিত্তশালীদেরকে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দিতে হবে এবং তাদের ধন–সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করে নিতে হবে। মালিকানার বিধানকে বাতিল করতে হবে। দরিদ্র শ্রেণীকে ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে শ্রেণী সংঘাতের জন্ম দিতে

হবে। এভাবে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের শ্রেণী বিজয় লাভ করবে এবং একটি প্রোলেতারিয়েত ডিক্টেটরশীপের প্রতিষ্ঠা পাবে।

ইসলাম এইসব কথা পুরোপুরি বাতিল করে। কেননা এসব কথা ইসলামী নীতিমালার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষশীল। বিত্তশালীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো, যদি কতিপয় বিত্তশালী এমন যে, বিত্তবৈভব তাদেরকে বিদ্রোহের পথে অনুপ্রাণিত করেছে এবং অন্যদেরকে জুলুম নির্যাতনের নিশানা বানিয়েছে এবং দুর্বল ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, তাহলেও বিত্তশালীদের মধ্যেই আল্লাহ্‌র এমন নেক বান্দা রয়েছে যারা বিত্তবৈভবের নিয়ামতে উপকৃত হয়ে আল্লাহর শুকর এবং নিজের সম্পদ থেকে আল্লাহর বান্দাদের হকও আদায় করে থাকে। ইসলামী বিধান অনুসারে কোন শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি সেই শ্রেণীর সকলকে দেওয়া যায় না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই জবাবদিহি করবে। আল্লাহপাক বলেছেনঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময় গচ্ছিত রাখা আছে।" (তূরঃ২১) "প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, তার জন্যে দায়ী সে নিজেই। কোন ভার বহনকারীই অপর কারো বোঝা বহন করে না।" (আনআমঃ ১৬৪)

কোরআন মজিদে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই নীতি পূর্বেকার দ্বীনসমূহেও মেনে নেয়া হয়েছেঃ "সে কি সেসব বিষয়ে অবহিত হয়নি যা মূসার সহীফা–সমূহে এবং সেই ইব্রাহীমের সহীফা–সমূহে বলে দেওয়া হয়েছে যে ওয়াদা পালন ও আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। --এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না এবং এই যে মানুষের জন্য কিছুই নেই, কিন্তু শুধু তাই, যার জন্য সে চেষ্টা করেছে।" (নাজমঃ ৩৬–৩৯)

ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে। কেননা এতে মানুষের প্রকৃতিগত আবেগের সান্ত্বনার রসদ রয়েছে। তাছাড়া এতে রয়েছে সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তা–ভাবনা। উপরন্তু এতে তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্থায়িত্বের বস্তুগত জামানত রয়েছে। ইসলাম অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে কিছু সীমা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা–নীতিকে সুনজরে দেখে এবং বিভিন্ন বিধি–বিধানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে একে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত মালিকানার নীতিতে মন্দের কিছু নেই, বরং সেইসব লোকই খারাপ যারা ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধির জন্য অন্যদেরকে শোষণ করে। যদি তারা জুলুম–নির্যাতন থেকে বিরত থাকে তাহলে এই বিত্ত–সম্পদ তাদের হাতেই

কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হতে পারে। যেমন হাদিস শরীফে বলা হয়েছেঃ "নেক ব্যক্তির কাছে হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কতই না ভালো !" এজন্যে ইসলামের চিন্তাধারা হলো মানুষের মন ও অন্তরকে সংশোধন করতে হবে। আর এই লক্ষ্য হাসিলে ইসলাম শুধু ওয়াজ–নসিহত করেই দায়িত্ব শেষ করে না, বরং মানুষকে আইনের অনুগত করে তার ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আবদ্ধ করে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির পারস্পরিক শত্রুতা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সংঘাতকে কোনক্রমেই আমল দেয় না। কেননা হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে আপদ হিসেবে গণ্য করে। আগুন যেমন কাঠখড় পুড়িয়ে ফেলে তেমনি এই আপদও ভালো কাজকে গিলে ফেলে। নবী করিম (সঃ) হিংসা–বিদ্বেষকে তার ভয়াবহ ও ধ্বংসসংকুল প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে উম্মতের রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলাম সেইসব ইজম বা মতবাদকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে, যে ইজম ধনী–গরীবের পারস্পরিক সংঘাতের ইন্ধন যোগায়। ঈমানপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব ইসলামের বসন্তকালীন বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলস্বরূপ। কোরআন মজিদে বলা হয়েছেঃ

"মুমিন পরস্পর ভাইস্বরূপ।" নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেনঃ, "হে আল্লাহর বান্দাহরা ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও।" এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই আবদুর রহমান বিন আওফ, উসমান বিন আফফান (রাঃ) প্রমুখ বিত্তবান সাহাবা এবং আবু হোরায়রা, আবুযর ও বেলাল (রঃ)–এর মত গরীব সাহাবী পরস্পর বন্ধু ছিলেন। কোন গরীব কোন ধনীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না এবং কোন ধনীই কোন গরীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ফলাতেন না। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে তাঁরা পরস্পর ভাই হয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলাম কোন সমস্যার এমন কোন সমাধান গ্রহণ করে না, যা থেকে আরো মারাত্মক সমস্যার উদ্ভব হয়। কম্যুনিষ্ট এবং সোশালিস্টরা দারিদ্র্য সমস্যা ও অর্থনৈতিক অসঙ্গতির সমাধান এভাবে পেশ করে যে, সমগ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করে তাকে এমন এক স্বেচ্ছাচারী ও জালেম ডিক্টেটরের থাবায় ন্যস্ত করতে হবে যাতে সে জাতির রিযিক এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর ওপর একচ্ছত্র অধিকারী হয়। কারোর জন্য এমন সুযোগ না থাকে যাতে সে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে সম্পদ অর্জন করে এবং নিজের ইচ্ছামাফিক তা ব্যয় করে। অন্য কথায়, এর অর্থ হলো দেশের সকল নাগরিককে দাসত্বের একই নিগড়ে আবদ্ধ করা। সকলেই একই প্রভুর নির্দেশের অনুগত হবে। আর এই প্রভুত্বের আড়ালে সেই দলটি ক্ষমতাবান হবে

যারা পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং জেল প্রভৃতির সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন হয় এবং জনগণ দলটির স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্যাতনের সামনে সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় হয়ে পড়ে, এবং তাদের প্রতিটি ভালো এবং মন্দ কাজের প্রশংসা কীর্তনে বাধ্য হয়। "না" শব্দটি বলা তো দূরের কথা, শাসকগোষ্ঠীর কোন অবৈধ নির্দেশে "কেন" বলতেও তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা তাদের নির্দেশ অমান্যই বা করবে কি করে ? কেননা তাদের করায়ত্তেই রয়েছে তাদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততির রিযিকের চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে তাদের কাছে কিছুই নেই।

কম্যুনিস্ট এবং সোশালিস্টরা জাতির স্বাধীনতা হরণ করে জনগণের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের মাধ্যমসমূহ করায়ত্ত করে নেওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। জাতিসংঘের নগর সংক্রান্ত দফতর থেকে কয়েক বছর আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাথা পিছু আয়ের একটি নকশা পেশ করা হয়েছিল। সেই চিত্রটি সাহের নাসিম নামক একজন আরব অধ্যাপকের "কম্যুনিজম ব্যবস্থা" শীর্ষক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

আমেরিকা	১৪৫৩ ডলার	
সুইজারল্যান্ড	৭৪৯	"
সুইডেন	৭৮০	"
বৃটেন	৭৭৩	"
ডেনমার্ক	৬৮৯	"
অস্ট্রেলিয়া	৬৭৯	"
বেলজিয়াম	৫৮২	"
হল্যান্ড	৫০২	"
ফ্রান্স	৪৮২	"
চেকোস্লোভাকিয়া	৩৭১	"
রাশিয়া	৩০৮	"
পোল্যান্ড	৩০০	"
হাঙ্গেরী	২৬৯	"
চীন	২৭	"

(মাথা পিছু আয়ের এই চিত্রটি সম্ভবত ৬০-এর দশকের হবে। -অনুবাদক)

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের এই নিম্নমুখী চিত্রের কারণ উৎপাদন মাধ্যমসমূহের ভুল ব্যবহার নয়, বরং ব্যক্তি মালিকানা হরণকারী ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে পদদলিত করা হয় এবং ব্যক্তির আশা-আকাংখা ও আবেগকে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে দেওয়া হয়। এতে ব্যক্তির

কোন মূল্য নেই। ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের কোন স্বাধীনতা নেই। সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন জীবন ব্যবস্থার মুকাবিলায় এই পদ্ধতির বিভিন্নমুখী নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধন কষণের ফলে সৃষ্ট জীবনের মানগত নিম্নমুখিতার স্বীকৃতি কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দও দিয়েছেন। বস্তুত তারাও এই জীবন ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অনুমিত হচ্ছে। তারা কম্যুনিজম ও সোশ্যালিজম থেকে প্রতিদিনই সরে যাচ্ছে এবং যে ব্যবস্থাকে তারা পছন্দ করতো না সে দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। *

শেষ কথা হলো, মার্কসিজমে সমাজের গরীব, অসহায় ও দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় না। আর এরাই হলো প্রকৃত সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। মার্কসীয় মতবাদে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর ওপরই পুরো দৃষ্টি রাখা হয়। অর্থাৎ কৃষক মজুরের প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত থাকে যাতে করে তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন এবং অন্যান্য শ্রেণীকে খতম করা যায়। কিন্তু মার্কসীয় সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় অসহায়, বিধবা, বৃদ্ধ এবং রোগীদেরকে কে জিজ্ঞাসা করবে? কেননা মার্কসীয় নীতির মূল কথাই হলো, "যে কাজ করবে না সে খাবেও না।"

---

* ইতি মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলো কম্যুনিজম ও সোশ্যালিজম ত্যাগ করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দিকে এগুচ্ছে–অনুবাদক

৩

দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী প্রচেষ্টাসমূহ

ইসলাম দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছে এবং তা খতম করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে যাতে এই সমস্যা মানুষের ঈমান-আকীদা, চরিত্র, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। এ জন্যই ইসলাম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৌলিক কতিপয় প্রয়োজন পূরণ আবশ্যিক করে দিয়েছে। খাদ্য, বাসস্থান, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক এবং সে যদি কোন কাজে অভিজ্ঞ হতে চায় তাহলে সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রভৃতি সংগ্রহ করে দিতে হবে। যদি সে কোন হাতের কাজ জানে তাহলে তাকে তার হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তাহলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। ইসলাম চায় সমাজের প্রত্যেক সদস্যই তার অবস্থা অনুযায়ী জীবনের মান-মর্যাদা পাক। এতে আল্লাহর ফরজ আদায়ে এবং জীবনের দায়িত্ব পালনে তার জন্য সহযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

এখন প্রশ্ন হলো ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক এই মান প্রত্যেক মানুষ কি করে পাবে? এবং এ ব্যাপারে ইসলাম কি কি মাধ্যম অবলম্বন করেছে? এইসব প্রশ্নের জবাব হলো -ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত মাধ্যমসমূহ অবলম্বন করেছেঃ

কাজকরা

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে দাবী করা হয় যে, সে কোন না কোন কাজ করুক এবং তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, সে বিস্তৃত বিশাল জমিনে চলাফেরা করুক এবং আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করুক। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন, "সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল কর তার বক্ষের ওপর এবং ভক্ষণ কর আল্লাহ্র রিযিক।" (মুলুকঃ ১৫)

দারিদ্র্য ও বুভূক্ষা মোকাবিলার প্রথম হাতিয়ার হলো কাজ। সম্পদ অর্জনের প্রথম মাধ্যম হলো কাজ এবং এই জমিনকে আবাদ করার জন্য কাজই হলো মৌলিক বস্তু। এই জমিনে মানুষকে খেলাফতের মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একে আবাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে সালেহ (আঃ) নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ খোদা নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে পয়দা করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (হূদঃ ৬১)

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যে কোন ধরনের কাজের দরজা খোলা রেখেছে। যে ব্যক্তি যে কাজে যোগ্য সেই কাজই সে অবলম্বন করতে পারে। কোন নির্দিষ্ট কাজ তার ওপর ফরজ নয়। কিন্তু সমাজের মঙ্গলে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হলে তাকে তা করতে হবে। ইসলাম অবশ্যই সেই সব কাজ অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাধীন কোন মেহনতী মানুষের যথাযথ শ্রমের মূল্য এবং প্রচেষ্টার ফল থেকে মাহরুম রাখা যায় না বরং মজুরের পারিশ্রমিক তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয়। কেননা যদি তার পারিশ্রমিক দেয়া না হয় তাহলে তার ওপর জুলুম করা হবে। আর ইসলামে জুলুম সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

কোন মেহনতী মানুষ হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং জীবনের মান বৃদ্ধি করতে পারে অথবা অর্জিত সম্পদ দিয়ে রোগ ও বার্ধক্যের সময় উপকৃত হতে পারে অথবা তার সন্তান-সন্ততি এবং উত্তরাধিকাররা তাঁর মৃত্যুর পর ফায়দা হাসিল করতে পারে। ইসলামী ব্যবস্থায় এ সবই বৈধ এবং এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যে সব কারণ ও বাস্তব বাধা মানুষকে কাজ ও কাজের প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখে ইসলাম সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেঃ

(১) তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসার দাবী ঃ কিছু মানুষ তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'র দাবী করে কাজ করা থেকে বিরত থেকে সম্পূর্ণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে যে, আল্লাহ পাক তাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক অবতীর্ণ করবেন এবং তারা তা খাবে। এইসব ভরসাকারী প্রকৃতপক্ষে ইসলামকেই বুঝতে পারেনি। কেননা আল্লাহর ওপর ভরসা এবং কাজ করা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং মুসলমানদের রীতি পদ্ধতি এই প্রশ্নে তো এই হওয়া উচিত, যা নবী

করিম (সঃ) একজন গ্রামবাসীকে বলেছিলেন। এই গ্রাম্য লোকটি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে নিজের উটনীকে খোলা ছেড়ে দিয়েছিল। নবী করিম (সঃ) তাকে বললেন, "আগে উটনী বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা কর।"

তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'র দাবীদাররা নিজেদের যুক্তির সপক্ষে রাসুলের (সঃ) এই হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দেবেন যেমন পাখীদের রিযিক দেওয়া হয়। পাখীরা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পুরে ফিরে আসে।" কিন্তু তারা এই হাদিস বুঝতে ভূল করেছেন। হাদিসটিতে 'তাগদু' শব্দ এসেছে। শব্দটির মূল হলো 'গুদুবুন' অর্থাৎ সকালে রিযিকের তালাশে বের হওয়া। হাদিসটিতে এ কথা বলা হয়নি যে, পাখিরা বাসায় বসে থাকে এবং আল্লাহ সেখানে তাদের রিযিক পৌছে দিয়ে থাকেন, বরং একথা বলা হয়েছে যে, পাখী যেমন আল্লাহর যমিন থেকে রিযিক হাসিলের জন্য বের হয় এবং পেট পূর্ণ করে ফিরে আসে তেমনি তোমরাও বের হও। তোমাদের জন্যও আল্লাহ নিজের যমিনে রিযিকের সামান বিস্তৃত করে রেখেছেন।

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি নিজের ঘর অথবা মসজিদে বসে থাকে আর বলেঃ আমি কোন কাজ করবো না এমনকি আল্লাহই আমার রিযিক দান করবেন--এই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মত কি? ইমাম সাহেব বললেন, "এই ব্যক্তি নিরেট মূর্খ। সে কি নবীর (সঃ) এই ফরমান শোনেনিঃ

'আমার রিযিক আমার নেযার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।'

তার কি নবীর এই এরশাদ জানা নেইঃ 'পাখিরা সকালে রিযিকের তালাশে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পুরে ফিরে আসে।"

রাসূলে খোদার সাহাবারা যমিনে ও সাগরে ব্যবসা করে বেড়াতেন এবং নিজেদের খেজুরের বাগানে কাজ করতেন। তাঁদের কাজ আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

মানুষ ও অন্যান্য জীবের সৃষ্টিতে আল্লাহর দাবী হলো বিস্তৃত যমিনে মানুষ ও সৃষ্ট জীবসমূহ স্ব স্ব খাবার এবং সামান প্রচেষ্টা ও মেহনতের মাধ্যমে হাসিল করবে। এ জন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমরা যমিন বক্ষে চলাচল কর এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ কর।" কোরআনের অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেছেন, "অতপর যখন নামাজ আদায় শেষ হবে তখন যমিনের ওপর ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র ফজিলত ও রুজী তালাশ কর।" (জুময়াঃ ১০)

বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর (রাঃ)কিছু লোককে তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্‌র দাবী করে নামাজের পর মসজিদে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে নিজের দোররা দিয়ে পিটালেন এবং বললেন, "কোন ব্যক্তি রিযিক অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে রিযিক দিন। প্রকৃতপক্ষে সে জানে যে, আসমান থেকে স্বর্ণ এবং রৌপ্য বর্ষিত হয় না। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে ফরমিয়েছেন, "যখন নামাজ শেষ হবে তখন যমিনের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর ফজিলত ও রুজী তালাশ কর।"

দুনিয়া পরিত্যাগ

কিছু লোক কোন কাজ করে না, আল্লাহর ইবাদতের জন্য তারা দুনিয়ার কাজ-কাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বলে, কোরআন মজিদেই আলাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আমি জ্বীন ও ইনসানকে দুনিয়ায় শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" এই আয়াতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে অন্য কোন কাজ করা কোনক্রমেই জায়েজ নয় বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

এই সব মানুষ দুনিয়া ত্যাগ প্রসঙ্গে নবী করিম (সঃ)-এর শিক্ষাসমূহ থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়েছে। তিনি ফরমিয়েছেন, দুনিয়ার কোন কাজ সঠিক নিয়্যতে এবং ইসলামী নির্দেশাবলীর প্রতি খেয়াল রেখে আনজাম দেওয়া হলে সেই কাজ স্বয়ং ইবাদাতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ যদি এই চিন্তায় জীবিকার তালাশে বের হয় যে, সে ধন-সম্পদ হাসিল করে নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্তানাদির ভরণ পোষণ করবে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মঙ্গল করবে অথবা ভালো কাজ এবং আল্লাহর পথে তার কালামকে বুলন্দ করার জন্য ব্যয় করবে --তাহলে আল্লাহর পথে এই কাজ এক ধরনের জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ জন্য আল্লাহ পাক জীবিকা অন্বেষণ উপলক্ষে যমিনের ওপর চলাফেরা ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে এই আয়াতে একত্র করেছেনঃ "কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করে; আর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।" (মুযাম্মিলঃ ২০)।

তিরমিজী শরীফে হজরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহর পথে জিহাদের পরে আমার নিকট মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্থাৎ রিযিকের অনুসন্ধানে ব্যয় করা। এই কথা বলে তিনি উপরে বর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ

দানের জন্য বলেছেন, "একজন সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন ও শহীদের সাথী হবেন।" (বুখারী)

কৃষি কাজে তিনি এভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, "কোন মুসলমান যখন কোন কিছুর চাষ করে অথবা কোন চারা লাগায়, অতঃপরঃ সেই ফসল থেকে পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে সেই মুসলমানের তরফ থেকে তা সাদকা হয়ে যায়। (বুখারী)

শিল্প ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রসঙ্গে নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি নিজের হাতে কামাই করে খাওয়া থেকে ভালো খাবার কখনই খায় না।" যে ব্যক্তি হালাল রুজির তালাশে ক্লান্ত হয়ে রাত কাটালো, সে যেন মাগফিরাতে পূর্ণ হয়ে রাত কাটালো।

ইমাম ইবরাহিম নখয়ী (রাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে-সত্যবাদী ব্যবসায়ী না সর্বদা ইবাদাতকারী ? তিনি বলেছিলেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী। কেননা মাপ-জোখের ও লেনদেনের সময় শয়তান তার কাছে এসে বিপথগামী করার অপচেষ্টা চালায় আর সে শয়তানের সাথে জিহাদ করে।

কাজে লজ্জাবোধ করা

কিছু লোক বিশেষ কোন কাজ করতে চায় না। কেননা এতে সে লজ্জা ও অপমানিত বোধ করে। যেমন, অনেক আরব কোন পেশা অথবা হস্তশিল্পকে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। এমন কি একজন আরবী কবি তার ঋণদাতাকে গালি দিয়ে বলতো যে, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে একজন তো কামার ছিল। কামার হওয়া যেন লজ্জাজনক এবং অপমানকর ব্যাপার। কিছু লোক এমনও রয়েছে যে, যারা অবজ্ঞার চোখে দেখা মেহনতমূলক পেশার চেয়ে অন্যের কাছে হাত পাতাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ইসলাম এইসব ভুল ধ্যান-ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করে কাজ এবং হস্তশিল্পের বিশেষ মর্যাদা ও মূল্য দেয়। বেকার থাকা এবং অন্যের ঘাড়ে চেপে থাকাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল পদ্ধতিতে রুজী-কামাই করা অত্যন্ত মর্যাদাকর ও শরীফ কাজ--অন্যরা তা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও।

বুখারী শরীফে যুবায়ের বিন আওয়াম থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি খোঁজ করে বোঝা বেঁধে বাজারে গিয়ে বিক্রয় করে এবং আল্লাহ তাকে বেইজ্জতী হওয়া থেকে বাঁচান। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে এই কাজ তার জন্য অনেক উত্তম। কেননা যার কাছে হাত পাতা হবে সে তাকে কিছু দিতেও পারে, আবার

নাও দিতে পারে।" এই হাদিস থেকে পরিষ্কার হয় যে, কাজ যত কঠিনই হোক এবং তা থেকে উপকার যত কমই হোক না কেন, বেকার থাকা ও মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে অনেক ভাল।

বুখারী শরীফেরই একটি হাদিসে আছেঃ নবী করিম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহপাক এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরান নি। সাহাবারা আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আপনিও কি?" রাসূল (সঃ) বললেন, "হ্যাঁ, আমিও কতিপয় কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরিয়েছি।"

মুসতাদরাক হাকিম নামক গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, দাউদ (আঃ) যুদ্ধের পোশাক প্রস্তুতকারী ছিলেন। আদম (আঃ) কৃষক ছিলেন। নূহ (আঃ) ছুতার ছিলেন। ইদরিস (আঃ) ছিলেন দরজী। মূসা (আঃ) ছিলেন রাখাল। ইসলামের ইতিহাসের বড় বড় ইমাম এবং দুনিয়াখ্যাত অমর আলেমদের অধিকাংশই বাপ-দাদাদের বংশ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন নি, বরং তাঁদের বাপ-দাদাদের জীবিকার পেশার মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এটাকে ইসলামী সমাজে কোনক্রমেই খুঁত হিসেবে ধরা হয়নি। অধিকাংশ আলেম ও ইমাম লিখিত পুস্তকে তাঁদের পেশার উপাধিসম্বলিত নাম উৎকলিত হয়েছে।

সফরে অনীহা

কিছু লোক আছে যারা নিজের শহর অথবা দেশ ও জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। যেখানে তাদের আপনজন ও বন্ধু-বান্ধব রয়েছে সেখানে কাজ না পাওয়ার কারণে তারা কাজও করে না। আবার কাজের জন্য স্বদেশ অথবা নিজের শহর ছেড়ে বাইরেও যেতে চায় না। তারা স্বদেশে বেকার থাকাকে অন্য এলাকার বিস্তৃত রিযিক ও সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

এ ধরনের মানুষকে ইসলাম হিজরতের উৎসাহ দিয়েছে এবং জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। উপরন্তু এটাও তাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র যমীন অত্যন্ত প্রশস্ত এবং মানুষের রিযিক কোন এক স্থানে সীমিত নয়। হাদিস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি জীবিকার অন্বেষণে নিজের সন্তান-সন্ততি ও দেশ ছেড়ে দূরে গেছে এবং এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে তার জন্মস্থান থেকে শুরু করে দাফনের স্থান পর্যন্ত প্রশস্ত যায়গা বেহেশতে দেওয়া হবে। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, "সফর কর এবং সম্পদশালী হয়ে যাও।" (তাবরাণী)

আল্লাহ পাক বলেছেন, "বস্তুত আল্লাহর পথে যে-ই হিজরত করবে যমীনে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সে অনেক জায়গা এবং দিন যাপনের জন্য বিরাট অবকাশ পাবে।" (আন নিসাঃ ১০০)

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, মদীনার এক ব্যক্তি মারা গেল। আল্লাহর রাসুল (সঃ) তার নামাজে জানাজা পড়লেন এবং বললেন, "এই ব্যক্তি যদি মদীনায় না মরে অন্য কোথাও মরতো তাহলে কতই না ভালো হতো!" সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা বললো, "হে আল্লাহর রাসুল। কেন?" তিনি বললেন, '' যে ব্যক্তি বিদেশ-বিভূঁইয়ে মারা যায় তার জন্য তার জন্মস্থান থেকে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত স্থানের সমান বেহেশতে স্থান হবে।'' এক রাওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় এক ব্যক্তির কবরের কাছে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "এই ব্যক্তি যদি বিদেশ বিভূঁইয়ে মারা যেত তাহলে কতইনা ভালো হতো।" এসব হাদিস থেকে উৎসাহ পেয়ে প্রথম যুগে মুসলমানরা দূর-দূরান্ত এলাকায় বেরিয়ে পরতেন। তারা সেখানে দ্বীনের তাবলীগের ফরজ আঞ্জাম দিতেন। রিযকের অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতেন।

সাদকা ও খায়রাতের উপর নির্ভরশীলতা

কিছু লোক আছে যারা কোন পরিশ্রম করে না। কোন কাজ অথবা জীবিকার অন্বেষণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদের সাদকা-খায়রাত ও জাকাত ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অন্যের কাছে ভিক্ষা চাওয়াকে নিজের জন্য মুবাহ মনে করে। এই সওয়াল বা ভিক্ষা যাঞ্চায় বেইজ্জতী এবং জিল্লতী থাকা সত্ত্বেও তারা এটা করে। শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে হাত পাততে দ্বিধা বোধ করে না। মুসলিম দেশে এ ধরনের লোক বেশী পাওয়া যায়। বাদশাহ, আমীর ও বিত্তশালীদের চারপাশে ভীড়কারী তোষামুদেরাও এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সব লোকের ব্যাপারে ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, যতক্ষণ তার শক্তি থাকবে এবং কামাই করার ক্ষমতা রাখবে সে কোন প্রকারেই জাকাত ও সাদকার হকদার হবে না। সুতরাং আবু দাউদ এবং নাসায়ীর কিতাবে বর্ণিত হাদিসে খোদার রাসুল (সঃ) যাকাত প্রার্থনাকারী দু'ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "কোন ধনী এবং কোন তাগড়া ব্যক্তি আর উপার্জনশীল ব্যক্তির যাকাতের মালে কোন অংশ নেই।"

এইভাবে ইসলামে মানুষের কাছে অপ্রয়োজনে হাত পাতা (অর্থাৎ খায়রাত ও সাদকা যাঞ্ছা করা) থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সঃ) ফরমিয়েছেন, ''সব সময়

মানুষের কাছে ভিক্ষা যাঞ্ছাকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার চেহারায় সামান্যতম গোশতও থাকবে না।'' মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে নবী (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অন্যের কাছে অপ্রয়োজনে শুধু নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করে সে নিজের জন্য আগুনের অঙ্গার চায়। চাইলে সে অঙ্গার বেশীও করতে পারে আবার কমও করতে পারে।''

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করিম (সঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাদকা, অবৈধ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মানুষের কাছে হাত পাতা সম্পর্কে বলেনঃ ''ওপরের হাত (প্রদানকারী) নীচের হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম।" সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ''তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সকালে বের হয় এবং সাদকা দানের উদ্দেশ্যে ও মানুষের কাছে মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার লক্ষ্যে, নিজের পিঠের ওপর জঙ্গল থেকে কাঠ বহন করে আনে। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে এই কাজ উত্তম। মানুষের কাছে চাইলে দিতেও পারে, নাও পারে। এজন্য ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম।" মুসনাদে আহমদে আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে --নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ "বান্দাহ যেই অন্যের কাছে হাত পাতার দরজা খোলে আল্লাহ তার ওপর দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার দরজা খুলে দেন।" নিসায়ী শরীফে আয়েদ বিন আমর থেকে রাওয়ায়েতকৃত–এক ব্যক্তি নবী করিমের (সঃ) খিদমতে হাজির হয়ে কিছু চাইলো এবং তিনি তাকে দিলেন। যখন সেই ব্যক্তি নিজের পা'কে দরজার চৌকাঠে রাখলো তখন নবী (সঃ) বললেন, "মানুষ যদি জানে যে, সওয়াল করায় কি ধরনের যিল্লতী এবং বেইজ্জতী রয়েছে তাহলে কেউ যেন কারো কাছে সওয়ালের উদ্দেশ্যে না যায়।" অবশ্য দু'অবস্থায় সওয়াল করা বা হাত পাতা দোষের কিছু নয়। প্রথমত সমকালীন শাসনকর্তা অথবা এমন কোন ব্যক্তির কাছে হাত পাতা যাকে আল্লাহ সওয়ালকারীর অভিভাবক বানিয়েছে। দ্বিতীয়ত কোন কঠিন প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সওয়াল করা। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের সেই প্রত্যেক ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছেঃ যে সুস্থ ও নাদুস নুদুস এবং উপার্জন করে খাওয়ার শক্তি রাখা সত্ত্বেও সমাজের বোঝা হয়ে থাকতে চায় এবং যে ভিক্ষা করাকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। যে ব্যক্তির যাকাত গ্রহণ অবৈধ, সেও যদি তা গ্রহণের বৈধ বলে চিন্তা করে এবং বৈধ কোন ওজর ব্যতিরেকে ভিক্ষা করে। এমন সকল গুনাহর কাজ করে যাতে শরীয়ত কোন শাস্তির বিধান রাখেনি এবং কাফফারাও দেওয়া প্রয়োজন নেই –তবুও মুসলমান শাসক এইসব কাজ যারা করবে তাদেরকে অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারবেন।

ধিকৃত পেশা

ইমাম গাযালী (রাঃ) নিজের লিখিত পুস্তক "ইয়াহইয়াও উলুমুদ্দীন"–এ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে রুজী–কামাইয়ের প্রশ্নে খারাপ পেশার কথাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন, "এমন কিছু পেশা রয়েছে যা করার জন্য প্রথমত কিছু মেহনত ও চেষ্টা ছাড়া কিছু শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিছু লোক শৈশবকালে তা শেখায় গাফলতি করে থাকে অথবা অন্য কোন কারণে শিখতে পারে না। বস্তুত সে কোন শিল্প বা বাণিজ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে উপার্জন করতে পারেনা। এইজন্য সে অন্যের পরিশ্রমের ফল খাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে। এমনিভাবে দু'ধরনের বাজে বা নীচু পেশার জন্ম হয়। প্রথম, চুরি–ডাকাতি।

দ্বিতীয়, ভিক্ষার পেশা। সাধারণ মানুষ চোর ও ভিক্ষুক উভয়ের ব্যাপারেই সতর্ক থাকে এবং তাদের হাত থেকে নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং এই দুই গ্রুপ অন্যের সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হিলা ও কৌশল অবলম্বনের ফন্দি–ফিকির করে। চোর–ডাকাতরা তো নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং নেতৃত্ব দিয়ে রাহাজানি করে। তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বিভিন্ন কৌশলে মাল লুট করে। আর ভিক্ষুকরাও অন্যের শ্রমলব্ধ সম্পদ লাভের চেষ্টা করে। তাদেরকে কিছু না দিয়ে অন্যের মত পরিশ্রম করতে বলা হলে তারা মানুষের সম্পদ লাভের বিভিন্নমুখী কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজের বেকারত্বের জন্য নানামুখী ওজর তালাশ করে। কিছু লোক নিজেদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে ধোকা দিয়ে অন্ধের এক দল সাজিয়ে ভিক্ষায় নামে যাতে মানুষ তাদেরকে অক্ষম মনে করে কিছু দেয়। এমনও কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পাগল অথবা রুগ্ন বলে প্রকাশ করে যাতে মানুষের মধ্যে দয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়ে তাদেরকে কিছু দেয়। এমনও কিছু আছে যারা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করার জন্য কিছু কাজ ও কথা শিখে নেয়। এই কথা ও কাজে প্রভাবান্বিত হয়ে মানুষ তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়। এমন কিছু কাজ আছে যার পারিশ্রমিক নেওয়া যায়। কিন্তু তাকে পারিশ্রমিক মনে করা হয় না। যেমন তাবিজ প্রদান ইত্যাদি কাজ। তাবিজ বিক্রেতারা শিশু এবং অজ্ঞদেরকে ধোকা দিয়ে বলে যে, এই তাবিজ বিভিন্ন ধরনের রোগের ওষুধ। গণক ও ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যারা বক্তৃতা করেন তারাও এই শ্রেণীভুক্ত। এই সব লোকের উদ্দেশ্য হলো–– অন্যের অন্তরকে বিভিন্ন কৌশলে প্রভাবান্বিত করে তাদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। চাওয়া ও ভিক্ষার হাত বাড়ানোর এই কৌশলের সংখ্যা হাজার দু'হাজারের মত হবে। ইমাম গাযালী (রাঃ)

চুরি ও ভিক্ষা উভয় ধিকৃত পেশা প্রসঙ্গে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিষয়ের প্রতি গভীরতারই প্রমাণ করে।

প্রচেষ্টার অভাব

জীবিকা অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা ও কাজ করতে না পারার শেষ শ্রেণীর লোক হলো তারা যারা কাজ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন চেষ্টা করতে পারে না। কেননা জীবিকার বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এই অবস্থায় তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হলো নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণের বোঝা সরকারের ওপর চাপিয়ে জীবিকা অন্বেষণের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা এবং নিজে বেকার বসে থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটানো। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের কোন ব্যক্তির কর্মপন্থায় উৎসাহ যোগায় নি, বরং ইসলাম সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর সাধারণভাবে এবং ক্ষমতাবান ও শাসকদের ওপর বিশেষভাবে এই দায়িত্ব অর্পণ করে যে, তারা যেন সেই ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী কোন কাজ তালাশ করে দেয় এবং জীবিকা অর্জনে তাকে সহযোগিতা করে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছেঃ এক আনসারী নবী করিমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের বেকারত্বের অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?" সে বললো, "কেন নয়? একটি গদি আছে যা আমরা গায়ে দিই এবং নীচেও বিছাই। একটি পেয়ালা আছে,যা দিয়ে আমরা পানি পান করি।" তিনি বললেন "যাও, উভয় বস্তুই নিয়ে এস।" যখন সেই ব্যক্তি উভয় বস্তুই নিয়ে এল তখন তিনি তা নিয়ে উপস্থিত মজলিশের সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, "এই দুটি জিনিষ কে খরিদ করবে।" এক ব্যক্তি বললেন, "আমি এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করতে পারি।" তিনি বললেন, "দুই অথবা তিন দিরহাম দিয়ে কেনার কোন খরিদ্দার আছে কি?" অন্য একজন বললো, "আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনতে পারি।" তিনি গদি ও পেয়ালা সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দুই দিরহাম নিয়ে নিলেন এবং আনসারীকে দিয়ে বললেন, "এক দিরহামের খাদ্য ক্রয় করে পরিবার-পরিজনকে দিয়ে এস এবং অন্য দিরহাম দিয়ে একখানা কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে এস।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং নিজের মুবারক হাত দিয়ে কুঠারের হাতল লাগালেন এবং বললেন, "এই কুঠার নিয়ে যাও এবং জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে এস এবং তা বিক্রয় কর। আর ১৫দিন আমার কাছে আসবে না।" সে ব্যক্তি চলে গেল এবং কাঠ কেটে বিক্রয় করতে থাকলো। ১৫ দিন পর যখন সে আসল তখন সে ১০ দিরহাম কামাই করে ফেলেছিল। এই ১০ দিরহাম থেকে সে কয়েক দিরহামের

কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য কিনেছিল। পুনরায় নবী করিম (সঃ) তাকে বললেন, "এইভাবে কামাই করে খাওয়া তোমার জন্য উত্তম। মানুষের কাছে চেয়ে-চিন্তে জীবন অতিবাহিত করলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কলঙ্কের প্রলেপ থাকবে। সওয়াল করা শুধুমাত্র তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ। এক, অত্যন্ত গরীব। দুই, যে বিরাট ঋণ ভারে জর্জরিত এবং যার ওপর শোণিতপাতের মূল্য প্রদান প্রয়োজন হয়।"

হাদিসটি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কামাই করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যাকাত ও সাদকা নিয়ে জীবন ধারণ করুক এটা নবী করিম (সঃ) পছন্দ করতেন না, বরং হালাল রুজীর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি এই ব্যক্তিকে সহযোগিতা করেছিলেন।

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে ইসলাম অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে অনেক অনেক অগ্রসরমান। অথচ এই সব ব্যবস্থা রাসূলের (সঃ) আগমনের কয়েক শতাব্দী পর মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অভাবগ্রস্তকে কিছু বস্তুগত সাহায্য প্রদান এবং শুধু মাত্র ওয়াজ-নসিহত করে ভিক্ষুকের অন্তরে ভিক্ষার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করাকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করে না, বরং ইসলাম সওয়ালকারীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতির দৃষ্টি প্রদর্শন এবং দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাকে সহযোগিতা করে থাকে। তাকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক করার জন্য সে যেন নিজের যোগ্যতাসমূহকে কার্যকর করে তোলে এবং অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকে।

দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা দূরীকরণে অন্যান্য মাধ্যম

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রচেষ্টা এবং মেহনতের হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার মুকাবিলা করা ইসলামে যদিও মৌলিক ব্যাপার তবুও সেই সব প্রতিবন্ধীর কি অপরাধ যারা কাজ করার কোন ক্ষমতাই রাখে না? সেই সব বিধবারই কি পাপ যাদের স্বামী তাদেরকে অসহায় রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে? ছোট ছোট শিশু এবং অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধদেরই কি অপরাধ? কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদেরই বা কি গোনাহ ? হঠাৎ করে আপাতমুসিবতে যারা জীবিকা থেকে মাহরুম হয়েছে তাদেরই বা কি পাপ? সমাজের এ ধরনের লোকদেরকে কি দান-দক্ষিণার ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে?

না। ইসলাম এইসব লোককেও দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে নাজাত দানের ব্যবস্থা করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো এক খান্দানের লোকজন অন্যের কাছে রাখতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

নিতে হবে। শক্তিশালী দুর্বলের কাজে আসবে। বিত্তশালী নিজের বুভূক্ষ ভাইয়ের ভরণ-পোষণ করবে। মর্যাদাবান এবং ক্ষমতাশালীরা নিজের প্রতিবন্ধী ও অসহায় আত্মীয়-স্বজনকে পায়ের ওপর দাঁড়ানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। কেননা প্রকৃতির নিয়মই হলো একই খান্দানের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশী হয় এবং একে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার করে থাকে। তারা পারস্পরিক দয়ার সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়। এটা একটা বাস্তব ব্যাপার। ইসলাম একে অত্যন্ত জোরের সাথে সমর্থন করেছেঃ "কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার।" (আনফালঃ ৭৫)

আত্মীয়তা এবং তাদের হক আদায়

ইসলাম আত্মীয়দের অধিকারসমূহের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোরআন-হাদিসে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও আত্মীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহারকারীদের কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের এরশাদ হলোঃ "আল্লাহতায়ালা সুবিচার-ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের (সেলাহ রেহমীর) নির্দেশ দিচ্ছেন" (নাহলঃ ৯০)

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করো না --মাতাপিতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতিও এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত।" (নিসাঃ ৩৬)

"সেই খোদাকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে একে হক দাবী কর এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।" (নিসাঃ ১)

"আত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদের হকও আদায় কর। এবং অপচয় করো না।" (ইসরাঃ ২৬)

"অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌছিয়ে দাও আর মিসকিন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটা উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তোষ চায়।" (রূমঃ ৩৮)

নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান রাখে তার উচিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহর আরশের পায়ার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক লটকে আছে। এই সম্পর্ক বলে, "যে আমাকে জুড়বে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে সে আল্লাহ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার ওয়াজিব করে বলেছেন, "নিজের বাপ-মা এবং ভাই-বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়দের সাথে ইহসান কর। এটা এমন একটি অধিকার যা আদায় করা অত্যাবশ্যক। রক্তের আত্মীয়তা বা বন্ধন কায়েম রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

কোরআন মজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সকল মানুষের চেয়ে এক আত্মীয়ের প্রতি অন্য আত্মীয়ের হক বেশী। কেননা তাদের মধ্যে নৈকট্য ও আত্মীয়তা রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি নিজের আত্মীয়ের খারাপ অবস্থা এবং বেকারত্বের সময় তার জন্য ও তার সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ না করে তা হলে সে আত্মীয়ের হক সম্পূর্ণরূপে আদায় করে না। যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর তার সম্পদের উত্তরাধিকার হয়ে শুধু শুধু ধন-সম্পদ হাসিল করতে পারে, তাহলে ইনসাফের দাবী হল সে নিকটাত্মীয়ের খারাপ অবস্থার সময় ব্যক্তিস্বার্থ বর্জিত কিছু খরচও করবে এবং এই খরচকে বিনা পুঁজিতে পাওয়া সম্পদের বিনিময় হিসেবে মনে করবে। নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর সে এই সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে।

কতিপয় আলেমের ধারণা আলোচিত আয়াতসমূহে ইহসান এবং আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের যে কথা বলা হয়েছে তা ওয়াজিব নয়। বরং তা মুস্তাহাব। তাদের বক্তব্যের জবাব হলো, আল্লাহ পাক আত্মীয়দের সাথে ইহসান ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে আত্মীয়দের অধিকার আখ্যায়িত করে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তা'হলে কোরআনের কোন্ আয়াতে এবং কোন্ হাদিসে একে মুস্তাহাব করা হয়েছে ?

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে অধিকার বা হকের অর্থ শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করা তাহলে ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদ'-এ যে জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন সেই জবাবই উল্লেখ করা যথেষ্ট। তিনি বলেছেনঃ

তার থেকে বড় সম্পর্ক ছিন্ন আর কি হতে পারে যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখছে তার আত্মীয় ক্ষুৎপিপাসায় তড়পাচ্ছে, গরম অথবা ঠান্ডায় মারাত্মক কষ্টে রয়েছে। এই অবস্থায় সে যদি তাকে এক লোকমা খাবার এবং এক ঢোক পানি না দেয় এবং তার

সতর ঢাকার ও শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার কাপড় না দেয়, এমন কি তাকে নিজের ছাদের ছায়ায় আরামও করতে না দেয় এটা কি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় না? এতেও যদি সম্পর্ক ছিন্ন না হয় তাহলে যে সম্পর্ক ছিন্নকে হারাম করা হয়েছে তা কি তা আমরা জানি না।

আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রশ্নটি কোরআন এবং হাদিসে ওয়াজিব করা হয়েছে। এই অনুগ্রহ প্রদর্শন না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে একজন সাধারণ মানুষের অধিকার থেকে কোন বস্তু অতিরিক্ত যা মন ও অন্তর বুঝতে পারবে এবং তার ওপর আমল করা যাবে?

রাসূলে খোদা (সঃ) ভাইবোনের হককে মা বাপের হকের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিজের মা বাপ এবং বোন-ভাইয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। অতঃপর আত্মীয়ের মধ্যে যারা নিকটবর্তী এবং তারপর যারা নিকটবর্তী।" তাহলে কোন্ কারণে এই হুকুম মানসূখ হয়ে যাবে? এবং কোন কারণে প্রথমটাকে (মাতা-পিতার হক) ওয়াজিব করা হবে আর দ্বিতীয়টাকে (বোন-ভাইয়ের হক) মুস্তাহাব রাখা হবে?

উম্মাহর ফকিহরা ঐক্যমত পোষণ করেন যে, স্বামীকে নিজের স্ত্রীর খোরপোষের জন্য এবং পিতাকে নিজের ও কন্যার খরচ ও পুত্রকে মাতাপিতার খরচের জন্য বাধ্য করা যায়। নিকটাত্মীয় এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজী কোন আত্মীয়কে অন্য আত্মীয়ের উপর খরচ করার প্রশ্নে কতটুকুন বাধ্য করতে পারে --সে ব্যাপারেই এই মতবিরোধ। যদিও নিকটাত্মীয় ও আত্মীয়দের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং ইহসান করাকে সকল ফকিহই দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী বলে মনে করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইসলামের মাযহাবসমূহের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বক্তব্যে ব্যাপকতা রয়েছে। ইমাম ইবনে কাইয়েম এই দুই ইমামের মতের সমর্থনে কোরআন ও হাদিস থেকে বহু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে তিনি আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে খরচ করার প্রশ্নে নবী করিম (সঃ) থেকে নিম্নে বর্ণিত হাদিসসমূহ নকল করেছেন।

সূনানে আবু দাউদে কালিব ইবনে মুনফায়াতুল হানাফি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, সে (কালিবের দাদা) নবীর (সঃ) নিকটে এসে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি কার সঙ্গে ইহসান করবো?" তিনি ফরমালেন, "নিজের মা-বাবার সঙ্গে, অতঃপর নিজের বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে এরপর

নিজের নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে।" এটা এমন একটা হক যা আদায় করা আবশ্যক এবং আত্মীয়ের সম্পর্ক কায়েম রাখার যোগ্য।

নাসায়ী শরীফে তারেক হাসাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আমি মদীনায় এলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলছিলেন, "দানকারীর হাত উঁচু থাকে এবং দানের শুরু নিজের পরিবার পরিজন থেকে কর। প্রথম মাতা-পিতাকে দাও, তারপর বোন এবং ভাইকে। এরপর যে বেশী নিকটের। তারপর যে আরো নিকটের।"

বুখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করিমের (সঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল ! সমগ্র মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হকদার কে যার সঙ্গে আমি উত্তম ব্যবহার করবো? তিনি ফরমালেন, "তোমার মা।" সে বললো, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাপ এর পরে যে বেশী নিকটের। অতঃপর যে তার চেয়ে বেশী নিকটের।"

তিরমিজিতে মায়াবিয়া উশাইরী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল। আমি কার সঙ্গে ইহসান করবো?' তিনি ফরমালেন, "নিজের মা'র সঙ্গে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এরপর কার সঙ্গে?" তিনি বললেন, ''নিজের মা'র সঙ্গে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এরপর কার সঙ্গে?" তিনি ফরমালেন, "নিজের বাপের সঙ্গে। অতঃপর যে বেশী নিকটের।"

সুনানে আবি দাউদে আমর বিন শুয়ায়েব নিজের পিতা থেকে এবং তিনি নিজের দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তাই হলো উত্তম খাদ্য যা তোমরা নিজেরা কামাই করে খাও। তোমাদের সন্তানাদিও তোমাদের এক ধরনের কামাই। তোমরা নিজের সন্তানাদির কামাইও বিনা শ্রমে খাও। নাসায়ীতে জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "প্রথমে নিজের বাপের ওপর সাদকা কর এবং যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে নিজের ঘরের লোকজনদের ওপর। যদি ঘরের লোকজনদের ওপর খরচ করার পর কিছু বেঁচে যায় তাহলে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের ওপর। আত্মীয়-স্বজনদের ওপর খরচ করেও যদি বেঁচে যায় তাহলে এইভাবে এবং এইভাবে।" (অর্থাৎ অতঃপর তাদের ওপর যে তাদের নিকটাত্মীয় এবং তারপর আরো যে বেশী নিকটাত্মীয়)

উদ্ধৃত সকল হাদিস নিম্নে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের তাফসির। "তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী কর। তার সাথে কাউকেই অংশীদার বানিও না এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" (নিসাঃ ৩৬)। "আত্মীয়দেরকে তাদের

হক দাও।” (ইসরাঃ ২৬) “আত্মিয়িদেরকে তাদের হক প্রদান কর।” (রুমঃ ৩৮) আল্লাহ আত্মীয়–স্বজনদের হককে মাতাপিতার হকের সাথে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে নবী (সঃ)ও একই ধরনের উল্লেখ করেছেন। যদি এই হকও হক না হয়, তাহলে আমরা জানি না সেটা কোন্ ধরনের হক? আর আল্লাহ আত্মীয়–স্বজনদের সাথে ইহসান করার হুকুম দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার হবে যে, কোন ব্যক্তি নিজের কোন আত্মীয়কে ভুখা, নাঙ্গা অবস্থায় মরতে দেখলো এবং সে তার দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আবরু রক্ষার সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও তাকে খাওয়ার একটা লোকমা দিল না এবং আবরু ঢাকলো না। আর যদি কিছু করেও সেটা ঋণ হিসেবে।

আত্মীয়–স্বজনদের ব্যাপারে ব্যয়

আল্লাহতায়ালা শিশুর উত্তরাধিকারের ওপরও ভরণ–পোষণের তেমনি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেমন শিশুর পিতার ওপর। কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ “যে বাপ চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকাল দুধ সেবন করতে থাকুক তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর দুধ সেবন করাবে। এই অবস্থায় সন্তানের পিতাকে সুনিয়মিতভাবে মায়েদের খোরাক–পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারো ওপর সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়–না মায়েদের এ জন্য কোন কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত যে, এ সন্তান তাদেরই আর না বাপকেই এ জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত যে এ তারই সন্তান। দুধ সেবনকারিণীর এই অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর তেমনি তার উত্তরাধিকারীদের উপর। (বাকারাঃ ২৩৩)

খোদাতায়ালার এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওমর (রাঃ)ও নির্দেশ জারি করেছিলেন। সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমর (রাঃ) একটি শিশুর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দেরকে এই ভিত্তিতে আটক করেছিলেন যে, তারা শিশুটির খরচপত্র বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকেই আর এক বর্ণনায় আছে যে, এক ইয়াতিমের অভিভাবক হজরত ওমর (রাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলো। তিনি তাকে বললেন, “এই ইয়াতিমের ওপর খরচ কর।'' অতঃপর বললেন, ''আমি যদি এই শিশুর দূরের কোন আত্মীয়কে পেতাম তাহলে আমি তাকে এই শিশুর ভরণ–পোষণের ভার দিতাম।” এই প্রসঙ্গে যায়েদ বিন ছাবেত থেকেও একটি রেওয়ায়েত আছে। তাতে বলা হয়েছে, “যদি শিশুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মা ও চাচা থাকে তাহলে মা'র উপর উত্তরাধিকারের অংশমত এবং চাচার উপর তার

উত্তরাধিকারের অংশমত শিশুর ওপর খরচ–পত্র ওয়াজিব হবে। হজরত ওমর এবং যায়েদ বিন ছাবেত–এর উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কোন সাহাবাই করেন নি।

ইবনে জুরাইহ বলেছেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''ওয়া আলাল ওয়ারেছে মিসলা জালেকা'র অর্থ কি। এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, "ইয়াতিমের উত্তরাধিকারদের ওপর উত্তরাধিকার হওয়ার কারণে ইয়াতিমের ওপর খরচ করা উচিত।" আমি বললাম, "শিশুর যদি কোন সম্পদ না থাকে তাহলেও কি শিশুর উত্তরাধিকারদেরকে লালন–পালন না করার দায়ে গ্রেফতার করা যাবে? তিনি বললেন, "তাহলে সে কি তাকে পরিত্যাগ করবে আর সে মরতে থাকবে?''

হাসান বসরী (রাঃ) এই আয়াতের অর্থ হিসেবে বলেছেন, "যে ব্যক্তি শিশুর উত্তরাধিকার হবে তার উপর ফরজ হলো সে শিশুর জন্য খরচ করবে। যতদিন পর্যন্ত সে উত্তরাধিকারের মুখাপেক্ষী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই খরচ অব্যাহত রাখতে হবে।" কাতাদাহ, মুজাহিদ, জাহহাক, যায়েদ বিন আসলাম, কাজী শুরায়েহ, কাবিসাহ বিন জুয়ায়েব, আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ, ইবরাহীম নাখয়ী, শাবী ও আসহাবে ইবনে মাসউদ এবং তারপর সুফিয়ান সাওরী, আবদুর রাজ্জাক এবং আবু হানিফা ও তাঁর আসহাব এবং তাঁর পর ইবনে হাম্বল, ইসহাক ও দাউদ (রঃ) প্রমুখ সলফে সালেহীনও এই তাফসির করেছেন।

আত্মীয়– স্বজনের ওপর খরচ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মত

আত্মীয়–স্বজনদের জন্য ব্যয় করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)–র মত হলো যে, গর্ভের আত্মীয়দের মধ্যে পুত্র অথবা পৌত্র হলে অথবা বাপ–দাদা হলে তাদের ওপর ব্যয় করা ওয়াজিব। তারা মুসলমান অথবা কাফের যাই হোক না কেন, তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে, এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়ের জন্য শুধু সেই অবস্থায় ব্যয় করা ফরজ যখন তারা মুসলমান হবে। কেননা নিজের কোন কাফের আত্মীয়ের জন্য খরচ করা কোন মুসলমানের ওপর ওয়াজিব নয়।

এইভাবে ব্যয়ের ব্যাপারে দু'টো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। এক, ব্যয়কারীর সামর্থ্য। দ্বিতীয়, যার জন্য ব্যয় করা হবে তার প্রয়োজন কতটুকু। যার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে সে যদি শিশু, বৃদ্ধ অথবা মহিলা হয় তাহলে শুধু তার অভাবের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আর সে যদি পুরুষ হয় তাহলে তার অভাবের সাথে সাথে দেখতে হবে যে, সে অন্ধ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নয় তো। এই অন্ধত্ব ও ব্যাধি তাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রেখেছে। যদিও সে সুস্থ ও সবল হয় এবং অন্ধ না হয়, তাহলে

তার জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব নয়। এই ব্যয় ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-র নিকট উত্তরাধিকার অনুযায়ী হবে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত মত অনুযায়ী শিশুর জন্য ব্যয়, বিশেষ করে পিতার ওপর বর্তাবে। হাসান বিন যিয়াদ লুলুমী এই কিয়াসকে সাধারণ করে বলেছেন, শিশুর খরচ-খরচা মাতাপিতা- উভয়ের ওপরই তার উত্তরাধিকার অনুযায়ী হবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) মত

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) মত হলো নিকটাত্মীয় যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং যে সাহায্য করবে তারা দু'জনে যদি একই বংশের হয় তাহলে অভাগ্রস্তের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এই প্রশ্নে উত্তরাধিকার হোক বা না হোক তা দেখার প্রয়োজন নেই। আর যদি অন্য বংশের হয় তাহলে ওয়াজিব নয়। কেননা ভরণ-পোষণ ওয়াজিবের জন্য উত্তরাধিকারের শর্ত আবশ্যিক, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যদি গর্ভের আত্মীয় হয় অথচ উত্তরাধিকার না হয়, তাহলে ইমাম আহমদের মতে শরয়ী বিধান মোতাবেক কোন ভরণ-পোষণ জরুরী নয়। এ সত্ত্বেও ইমাম আহমদের পর তার মতাবলম্বীরা সেই সব আত্মীয়ের উত্তরাধিকার প্রশ্নে ইমাম আহমদের মতের ভিত্তিতেই ব্যয়ভার ওয়াজিব করেছেন। কেননা তাদের নিকট ভরণ-পোষণ উত্তরাধিকারের অংশ বিশেষ। ইমাম আহমদের নিকট ব্যয়কারী এবং যাকে ভরণ-পোষণ করা হচ্ছে উভয়কেই একই ধর্মাবলম্বী হওয়া ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। যদিও এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর নিকট মাতাপিতার জন্য এই শর্ত প্রয়োজন নেই। যার ওপর কোন ব্যক্তির ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তার জন্য ইমাম আহমদের মত অনুযায়ী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। কাজী আবু উয়ালা বলেছেন, এমনিভাবে যার ওপর নিজের আত্মীয়-স্বজন যেমন ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চাচা প্রমুখের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হয়ে পড়েছে তার ওপর তার পবিত্রতার খেয়াল রাখাও অত্যাবশ্যক। যখন কোন ব্যক্তির কারো পবিত্রতার খেয়াল রাখা আবশ্যক তখন তার ওপর সেই ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ-পোষণও ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কেননা সে এভাবেই নিজের পবিত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

ফকিহরা আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের দু'টি শর্ত আরোপ করেছেন। প্রথম শর্ত হলো যার জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাকে অভাবগ্রস্ত এবং অক্ষম হতে হবে। যদি সে কোথাও থেকে সম্পদ পেয়ে যাওয়ার কারণে অথবা কোন কাজ করার ফলে

বিত্তবান হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব নয়। কেননা ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধু সহানুভূতি, দুঃখ প্রকাশ এবং সাহায্যের আবেগই কার্যকর থাকে। বিত্তশালী ও ধনবান হয়ে যাওয়ার পর আর কেউ এর যোগ্য থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাকারীর নিকট নিজের এবং নিজের স্ত্রীর ব্যয়নির্বাহের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে। হজরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, ''প্রথমে নিজের ওপর খরচ করো, তারপর নিজের সন্তান-সন্ততির ওপর।" নিকটাত্মীয়ের ওপর খরচ করা পারস্পরিক সহানুভূতি অনুযায়ী হয়েথাকে।

এ জন্য আবশ্যক হলো নিজের মৌলিক প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাল থাকলে তাহলে তাদের জন্য খরচ করা যাবে। মৌলিক প্রয়োজনের অর্থ হলো নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্ততির ওপর খরচ করা।

কোন জিনিস দিয়ে ভরণপোষণ

ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের জন্য ভরণ-পোষণের যে নির্দেশ দিয়েছে সে জন্য সম্পদের কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। কেননা স্থান, কাল এবং অবস্থা ভেদে মানুষের প্রয়োজনও পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনিভাবে-ভরণ পোষণকারীদের অবস্থারও পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো কারো অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল হয় আবার কখনো মধ্যম ধরনের বিত্তবান হয়। এ সকল অবস্থায় ইসলামের বিধান হলো ভরণ-পোষণকারীর ব্যয়ের সামর্থ এবং ভরণ-পোষণপ্রাপ্তির অধিকারীর অভাব, উভয় বস্তুকেই খেয়াল রাখতে হবে। আত্মীয় সঙ্গতভাবে একে অপরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

"স্বচ্ছল অবস্থায় লোক নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেওয়া হয়েছে সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না।" (তালাকঃ ৭)

"স্বচ্ছল অবস্থাশালী ব্যক্তি নিজ তওফিক অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী সঠিক প্রচলিত পন্থায় তা আদায় করবে।" (বাকারাহঃ ২৩৬)।

"সন্তানের পিতাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মা'দের খোরাক পোশাক দিতে হবে।" (বাকারাঃ২৩৩)।

রাসূলে মকবুল (সঃ) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দকে একবার বলেছিলেন, "নিজের স্বামীর সম্পদ থেকে এতখানি গ্রহণ কর যতখানি তোমার এবং তোমার বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট হয়। ফকিহরা ভরণ-পোষণের মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলো শামিল করেছেন। (১)

খাওয়া ও পান করা (২) শীত-গ্রীষ্ম অনুযায়ী পোশাক (৩) বাসস্থান এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র (৪) যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করার যোগ্য নয় তার জন্য চাকর (৫) যার বিয়ের প্রয়োজন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা (৬) ভরণ-পোষণযোগ্য স্ত্রী ও বাচ্চাদের ওপরও ব্যয় করা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে কুদামাহ নিজের গ্রন্থ আল কাফিতে লিখেছেন, "ভরণ-পোষণ অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন মুতাবিক হওয়া চাই। কেননা ভরণ-পোষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করা। যদি তার নিজের সেবার জন্য চাকরের প্রয়োজন হয়, তাহলে ভরণ-পোষণকারীর ওপর চাকরের ব্যয়ও ওয়াজিব হবে এবং তার স্ত্রী থাকলে তার ব্যয়ও। এরপর তিনি বলেন, "ভরণ-পোষণকারীর ওপর এটা ওয়াজিব হলো যে বাপ, দাদা এবং পুত্র প্রভৃতির মধ্যে যদি কেউ বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তার বিয়ে দিতে হবে। কেননা এটা তার প্রয়োজন। এর থেকে বঞ্চিত করা হলে তার জন্য ক্ষতিকারক হবে।" এ জন্যে বিয়েও ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খানা-পিনা এবং পোশাকের সমতুল্য। অথচ এটা ঠিক হবে না যে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে নীচু মনে করে এমন মহিলা এনে দেওয়া যে তার জন্য অনুপযুক্ত এবং মর্যাদার সাথে খাপ খায় না।

আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ শুধু ইসলামেরই বিধি

ইসলাম বিত্তবান আত্মীয়ের ওপর নিজের গরীব এবং অক্ষম আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করে সামাজিক নিরাপত্তার (Social Security) ভিত্তি রেখেছে। ইসলাম একে শুধুমাত্র মুস্তাহাব করেনি। বরং একে এমন এক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যা আদায়ের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহপাক দিয়েছেন। ইসলামের ফিকাহ শাস্ত্রে কিতাবুল নাফকাতের অধীন আত্মীয়ের ব্যয়ভার বহনের অধ্যায়ে যেসব নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে আমার ধারণায় এ ধরনের নির্দেশ প্রাচীন ধর্মসমূহের কোথায়ও পাওয়া যাবে না এবং আধুনিক যুগের নতুন আইন-কানুনসমূহের কোথায়ও এর ধারণাও মিলবে না। ইসলাম গরীব ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানের এ অধিকার দিয়েছে যে, সে নিজের সম্পদশালী ও স্বচ্ছল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ভরণ-পোষণ প্রশ্নে মামলা দায়ের করতে পারে। এটা সেই অধিকার যাকে আমরা ইসলামী সমাজে একটি সাধারণ কথা হিসেবে মনে করি। কেননা আমরা ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জেনেছি এবং বয়োবৃদ্ধের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কিন্তু অমুসলিম জাতিসমূহ যাদেরকে আমরা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করি তাদের কাছে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তাদের কাছে এটা বোধগম্যই নয়। আমার শিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা "ইসলাম ও মানব জগতে তার

প্রয়োজনীয়তা" নামক নিজের গ্রন্থে ইসলাম ও পারিবারিক জীবনের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"সম্ভবত এটা এখানে উল্লেখ করাই উত্তম হবে। ফ্রান্সে অবস্থানকালে এক বাসায় আমি কিছুকাল ছিলাম। সেই বাসায় চাকরাণী হিসেবে থাকতো এক যুবতী। তার চেহারায় বংশীয় মর্যাদার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতো। আমি বাসার মহিলা মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম এই মেয়েটি কেন চাকরাণী হয়ে আছে? তার কি কোন নিকটাত্মীয় নেই, যে তাকে এই কাজ থেকে ছাড়িয়ে নেবে এবং তার জন্য জীবন যাপনের সবকিছু সরবরাহ করবে? জবাবে সে বললো, মেয়েটি শহরের একটি ভালো পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। তার একজন চাচা বিরাট ধনী। কিন্তু সে তার দিকে কোন নজরই দেয় না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে তার ব্যাপারটি আদালতে কেন উত্থাপন করে না? আদালতের মাধ্যমে সে তার চাচাকে ভরণ-পোষণে বাধ্য করতে পারে। আমার এই কথায় সে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং আমাকে বলল, তাদের দেশে এমন কোন আইন নেই যার মাধ্যমে মেয়েটি নিজের চাচার কাছে এ ধরনের কোন দাবী করত পারে। আমি তখন তাকে এই প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশাবলী বুঝিয়ে দিলাম। সে বলতে লাগলো, কে আছে যে আমাদের জন্য এমন আইন বানাবে? যদি আমাদের দেশে এটা আইনগত দিক থেকে বৈধ হয় তাহলে কোন মেয়ে বা মহিলা এমন পাওয়া যাবে না --যে কোন কোম্পানী, কারখানা অথবা ফ্যাক্টরী অথবা সরকারের কোন বিভাগে কাজ করার জন্য ঘর থেকে বের হবে।"

৪

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব

ইসলাম প্রত্যেক বিত্তবানকে এ কথার অনুগত বানিয়েছে যে, সে রুজীর অন্বেষণে তৎপর থাকবে। যাতে সে নিজে এবং নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সে আল্লার পথে কিছু খরচও করবে। যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে পারে না এবং তার নিকটে সঞ্চিত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পদও নেই --যা দিয়ে সে নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তার ভরণ-পোষণ এবং স্বচ্ছলতার দায়িত্ব আত্মীয়দের উপর। তাকে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার নীচুতা থেকে রক্ষা করা তাদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু প্রত্যেক গরীব ও অভাবগ্রস্তের এমন স্বচ্ছল ও বিত্তবান আত্মীয় থাকে না, যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। এই অবস্থায় সেই গরীব ও অক্ষম মানুষ কি করবে যার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব নেওয়ার মত কোন নিকটাত্মীয় নেই? অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম মানুষ যেমন ইয়াতিম, শিশু, বিধবা মহিলা, অত্যন্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কি করবে? আর তারাই বা কি করবে যাদের শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের কোন মাধ্যম পায় না? এ ছাড়া সেই সকল লোকের কি হবে যারা কাজ করে কিন্তু সেই কাজের মাধ্যমে এত আয় করতে পারে না, যা দিয়ে তার পরিবারের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হতে পারে? এই সকল লোককে কি দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও অভাবের মধ্যে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে? আর সমাজ তামাশা দেখবে? অথচ সেই সমাজে যথেষ্ট সম্পদশালী বর্তমান রয়েছে। তারা কি তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত রাখবে?

ইসলাম সমাজের এ ধরনের লোকদেরকে ভুলে যায়নি। বরং আল্লাহ পাক তাদের জন্য বিত্তবানদের সম্পদে একটি নির্ধারিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই পরিমাণ আদায় ফরজের মর্যাদা রাখে। একেই বলা হয় যাকাত। যাকাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো গরীব-মিসকিনদের অভাবকে খতম করা। যাকাতের হকদারদের মধ্যে ফকির-মিসকিনরাই তালিকার প্রথমে রয়েছে। বরং কিছু কিছু স্থানে তো নবী করিম (সঃ) যাকাত গ্রহণকারীদের তালিকা বর্ণনাকালে ফকির মিসকিনদেরকেই শুধু দিতে

বলেছেন। যেমন হযরত মায়াজকে (রঃ) ইয়েমেন প্রেরণকালে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীব–মিসকিনদেরকে তা দেবে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের মত হলো যে, গরীব ও ফকিরের সাহায্য–সহযোগিতা ছাড়া যাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোন স্থানই নেই।

কৃষি পণ্যের যাকাত যেমন তরকারী, ফল, শাক প্রভৃতির ওপর দশমাংশ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। নবী আকরামের (সঃ) ফরমান হলো, "যে জমি আল্লাহর রহমতের পানিতে সিক্ত হয় তার উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ এবং যে জমিতে কূপ অথবা নদী প্রভৃতির মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয় তার উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে"। বর্তমান যুগে ভবন ও ফ্যাক্টরীকে কৃষি জমির সাথে কিয়াস করতে হবে। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, মধুর ওপরও মোট উৎপাদনের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং অন্যান্য প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন রেশম গুটি ও দুধদানকারী গাভী এবং মহিষ প্রভৃতিকে এর ওপর কিয়াস করতে হবে। কিয়াস সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট সেই শরীয়তের মূল বিষয়ের একটি, যা আল্লাহ পাক হক ও ইনসাফের সাথে নাজিল করেছেন। এ জন্য যেভাবে দু'টি ভিন্ন বস্তুকে যেমন এক বলা যায় না তেমনি দু'টো একই ধরনের বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও করা যায় না। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের মালের ওপর প্রত্যেক নিসাবধারী মুসলমানের আড়াই ভাগ যাকাত ফরজ হয়। দুধপ্রাপ্তি যোগ্য এবং বংশ বিস্তারের জন্য রক্ষিত প্রাণী যেমন উট, গাভী, বকরী প্রভৃতির ওপরও প্রায় একই পরিমাণ যাকাত ফরজ হয়ে থাকে। শর্ত হলো নিসাব পর্যন্ত পৌছতে হবে। বছরের বেশীর ভাগই বিনা মূল্যে ঘাসপানি খাইয়ে চরানো হয়। কিন্তু হযরত ইমাম মালেক (রঃ) চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত ঐ অবস্থাতেও ওয়াজিব করেছেন যখন তার মালিক সারা বছর খাইয়েছে এবং পানি পান করিয়েছে। কতিপয় সাহাবা এবং তাবেয়ীন ঘোড়ার ওপরও যাকাত ওয়াজিব করেছেন। ইমাম আবু হানিফা এই মতেরই সমর্থক।

খননকৃত পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের ওপরও পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। ফকিহদের মতে, খনিজ সম্পদও এই নির্দেশের আওতায় আসবে। যদিও এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এই পঞ্চমাংশ যাকাতের মত বন্টন করে দিতে হবে অথবা তাকে ফাই–এর মালের মত সরকারের সাধারণ মুসলিহাতে খরচ করা হবে।

এতো হলো সম্পদের যাকাত। এছাড়া এক ভিন্ন ধরনের যাকাত রয়েছে। যা ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয়। তাকে ফিতরার যাকাত বলা হয়। ইসলাম তাকে রমযান মাসে রোযা পূর্ণ করা এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ফরজ করেছে। এটা ফরজ হওয়ার পেছনে নিম্নলিখিত হিকমতসমূহ প্রচ্ছন্ন রয়েছেঃ

(১) রমযান মাসে রোযাদারদের ছোট-খাটো গুনাহ এই ফিতরার মাধ্যমে মাফ করা হয়।

২) ফকির-মিসকিনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করা যে, মুসলিম সমাজ ঈদের দিন তাদের জন্য ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে নিজের ভ্রাতৃত্ব ও মুহাব্বতের আবেগ প্রকাশ করে এবং তাদেরকে নিজের আনন্দে শরীক করতে চায়।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিতরা এ জন্য ফরজ করেছেন যাতে রোযাদার এর মাধ্যমে গুণাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং গরীব-মিসকিনদের খানাপিনার বস্তু লাভ হয়।

ফিতরার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হলোঃ

১) ফিতরা মালের ওপর নয় বরং ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয়।

২) ফিতরা শুধু সম্পদশালী ও সাহেবে নিসাবের ওপরই ফরজ হয় না বরং রাসূলে খোদা (সঃ) তা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করেছেন। সে গোলাম বা দাস হোক অথবা স্বাধীন, মহিলা হোক বা পুরুষ, ধনী হোক বা নির্ধন। কিন্তু শর্ত হলো ভিক্ষুকের কাছে নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ঈদের দিনের রাতের খাবার থেকে অতিরিক্ত খাবার থাকতে হবে।

এই নির্দেশে মুসলমানকে স্বচ্ছল অবস্থায় খরচ করার প্রশিক্ষণ দানই ইসলামের লক্ষ্য। যাতে তার হাত যঞ্চাকারীর হাত হওয়ার চেয়ে প্রদানকারীর হাত হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, "তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের প্রশ্নে আল্লাহ তাদের বিত্তের মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করেন এবং দরিদ্রের প্রশ্নে আল্লাহ তার তরফ থেকে তাকে অতিরিক্ত দিয়ে থাকেন যতটুকু সে প্রদান করে।" এই প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা অন্যান্য ইমামদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহেবে নিসাব হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। ফিতরা প্রদানকরিী মুসলমানের শুধু নিজের ফিতরা প্রদানই ওয়াজিব নয় বরং স্ত্রী, সন্তান এবং যার ভরণ-পোষণ তার দায়িত্বে থাকে তার ফিতরাও তার প্রতি ওয়াজিব হয়।

ইসলামে ফিতরার পরিমাণ এত কম রাখা হয়েছে, যাতে উম্মাহর বেশীর ভাগ লোকই বিনা ক্লেশে আদায় করতে পারে। এই পরিমাণ --নবী করিম (সঃ) এর ঘোষণা অনুযায়ীঃ খেজুর, মুনাক্কা এবং গমের এক সা'। ফিতরা প্রদানকারী এলাকার বাসিন্দা সে এলাকায় যে খাদ্য বেশী খাওয়া হয়, তার এক সা'ও প্রদান করা যায়। ওজনে এক সা' প্রায় সোয়া দু'সেরের সমান। বর্ণিত আছে যে, ওমর বিন আবদুল আজীজ, হাসান এবং আতা প্রমুখ ফিতরার পরিমাণ খাদ্যের মূল্য দিয়ে আদায় করতেন। ইমাম আবু হানিফার মতও তাই। বর্তমান যুগে ফকির এবং অভাবগ্রস্তের জন্য

সাদকায়ে ফিতরার এই রূপ (টাকা–পয়সা প্রদান) বেশী উপকারী। বস্তুতঃ সাদকা–ফিতরা ইত্যাদির উদ্দেশ্য হলো ফকির এবং অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করে তাকে সম্পদশালী বানানো। এ জন্যে এই উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে নগদ আকারে ফিতরা প্রদানই সবচেয়ে উত্তম।

ইসলামে যাকাতের স্থান

এটা সেই দ্বীন ইসলামের একটি মুজেজা। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান হওয়ার অকাট্য দলিল এবং এ কথার প্রকাশ্য নিদর্শন যে, এই দ্বীন আল্লাহপাকের সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী পয়গাম। শত শত বছর অতীত হয়েছে। ইসলাম দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা এবং ফকির–মিসকিনদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যার সমাধান এমনভাবে সম্পাদন করেছে যে, যতদিন সেই সমাধানের ওপর আমল করা হয়েছে ততদিন মুসলিম সমাজে ধনী–গরীবের সংগ্রামের কোন প্রশ্নই উঠেনি। কোন ব্যক্তি অথবা কোন দলের নিজের অধিকার দাবীর কোন প্রয়োজনই পড়েনি। ইসলাম এই সমস্যার কোন ক্ষণস্থায়ী সমাধান প্রস্তাব করেনি। ইসলামী শিক্ষা এবং আহকামে এটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাভুক্তও নয়। বরং এটা ছিল একটি স্থায়ী সমাধান এবং তা দ্বীনে মৌলিক ও বুনিয়াদি মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। এই যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহর সম্পদ এবং সমকালীন শাসকদের দায়িত্বের মধ্যে ফকির–মিসকিনদের জামানত প্রদান করেছেন। এই যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর তৃতীয় স্তম্ভ। বড় বড় রোকনের অন্যতম রোকন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত ওমরের একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নবী করিম (সঃ) বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর রাখা হয়েছে। প্রথম, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসুল। দ্বিতীয়, নামাজ কায়েম করা। তৃতীয়, যাকাত প্রদান। চতুর্থ, রমযানের রোযা রাখা এবং পঞ্চম হলো সামর্থ্য হলে বাইতুল্লার হজ্জ করা। কোরআন মজিদে আল্লাহ পাক যাকাতকে শিরক থেকে তওবা, নামাজ কায়েমকে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হওয়া এবং ইসলামী সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার শিরোনাম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধকারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন, "অতঃপর যদি তারা তওবা করে ও নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং রহমকারী।" (তওবাঃ ৫) "অতঃপর যদি তারা তওবা করে ও নামাজ কায়েম করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" (তওবাঃ ১১)

এ কথার অর্থ হলো কোন কাফির যতক্ষণ পর্যন্ত শিরক এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বস্তু থেকে তওবা না করবে ও নামাজ কায়েম না করবে এবং যাকাত আদায় না করবে ততক্ষণ সে মুসলমানদের জামায়াতে শামিল হতে পারবে না। নামাজ মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনি ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম এবং যাকাত তাদের মধ্যেকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ করে। নামাজ কায়েম এবং যাকাত আদায় না করা হলে সে দ্বীনি ভ্রাতৃসম্পর্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। নামাজ ও যাকাত মুসলমানদের জামায়াতের একজন সদস্য বানিয়ে দেয় এবং তাকে তাদের লাভ–লোকসানের সমান অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করে। এই ভ্রাতৃ সম্পর্কে শামিল হওয়ার জন্য নামাজ এবং যাকাত আবশ্যিক শর্ত।

কোরআন মজিদ এবং সুন্নাতে নববীতে আমাদেরকে নামাজের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। এটা নামাজ এবং যাকাতের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে। একজন মুসলমানের ইসলামের পূর্ণতা নামাজ এবং যাকাত দিয়েই লাভ হয়। নামাজ ইসলামের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে সে দ্বীন কায়েম করে। আর যে নামাজ কায়েম করে না সে দ্বীনের সমগ্র ইমারতই ধ্বংস করে। যাকাত ইসলামের পুল। যে এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে ওপারে যায় সে নাযাত লাভ করে। আর যে এদিক–সেদিক করে সে ধ্বংসে নিপতিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "তোমাদেরকে নামাজ কায়েম এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে যাকাত আদায় করে না তার নামাজই হয় না।" জাবের যায়েদ থেকে বর্ণনা করে বলেছেনঃ "নামাজ এবং যাকাত এক সাথে ফরজ করা হয়েছে। দু'টির মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন "অতঃপর যদি সে তওবা করে নেয় এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে সে তোমাদের দ্বীনি ভাই।" এরপর তিনি বলেন, "নামাজ শুধু সেই অবস্থায় হবে যখন নামাজ আদায়কারী যাকাতও আদায় করবে।" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ পাক হজরত আবু বকরের (রাঃ) ওপর রহমত নাজিল করুন। তিনি একথা কত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।" এর অর্থ হলো এই যে, হজরত আবু বকরের নির্দেশ ছিলোঃ "আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি যাকাত এবং নামাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

কোরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা ফরমিয়েছেন, যাকাত আদায় করা মুমিনিন, মুহসিনিন, মুত্তাকীন এবং নেককারদের গুণাবলীর অন্যতম গুণ। অন্যদিকে তা আদায় না করা মুশরিকীন এবং মুনাফিকীনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। এটা ঈমানের কষ্টি পাথর এবং নিষ্ঠার দলিল। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করা হয়েছে, "সাদকা হলো দলিল।" এবং যাকাত ইসলাম ও কুফুর এবং ইমান ও নিফাক এবং তাকওয়া ও ফিসক–ফুজুরীর মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া করে। এজন্যে কোন ব্যক্তি যাকাত

আদায় ব্যতিরেকে মুমিনদের দলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। আর মুমিনদের জন্যই আল্লাহপাক পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের সুস্পষ্ট ওয়াদা করেছেন। তিনি তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের নিশ্চয়তা এবং হেদায়াত ও রহমতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়।" যাকাত আদায় ছাড়া মানুষ নেককার হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। "যারা নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এই সকল মুমেনদের জন্যই কোরআন হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ।" (লুকমানঃ৪)

যাকাত আদায় ব্যতিরেকে মানুষ পরহেজগারী এবং নেককার লোক হিসেবে গণ্য হয় না। আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পুণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফিরিশতাকে এবং খোদার অবতীর্ণ কিতাব ও তার নবীদেরকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতার সাথে মান্য করবে; আর খোদার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধনসম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্য, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করবে; এছাড়াও নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে, দারিদ্র্য, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুতঃ এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী।" (বাকারা ঃ ১৭৭)

যাকাত ছাড়া মুসলমানদের থেকে সেই সব মুশরিককে পৃথক করা যায় না যাদের সম্পর্কে কোরআন মজিদে বলা হয়েছেঃ "সেই মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত যারা যাকাত দেয় না এবং পরকাল অমান্য করে।" (হামিম আস-সাজদাঃ৭)

যাকাতই সে মুনাফিকদের ব্যাপারে কষ্টিপাথর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন, "তারা নিজের হাতকে ভালো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (তওবা) তারা খোদার রাস্তায় খরচ করলেও তা বড় অনিচ্ছায় করে।"

যাকাত আদায় ছাড়া মানুষ আল্লাহর রহমতের যোগ্য হতে পারে না। যাকাতকে আল্লাহ পাক ঈমানদার, তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং যাকাত প্রদানকারীদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "মুমিন পুরুষ ও মুমিন মেয়েলোক-- এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে" (তওবাঃ ৭১)। "কিন্তু আমার রহমত সব জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর

আমি তা সেই লোকদের জন্য লিখে দিব --যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নির্দশনসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। (আরাফঃ ১৫৬)

যাকাত আদায় ছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সকল ঈমানদারদের বন্ধুত্বের যোগ্য হতে পারেনা। আল্লাহ পাক বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেইসব ঈমানদার লোক --যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং খোদার সামনে অবনমিত হয়।"

যাকাত প্রদান ছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহর সেই সাহায্যের যোগ্য হতে পারে না যে সাহায্যের ব্যাপারে তিনি ওয়াদা করেছেনঃ "আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল। এরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমরা যদি যমিনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, নেকীর হুকুম দেবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।" (হজ্জঃ ৪০-৪১)

ইহ ও পরকালে যাকাত আদায় না করার শাস্তি

ইসলাম যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছে। আখিরাতে শাস্তির প্রশ্নে আল্লাহর ইরশাদ উল্লেখ যোগ্য। সোনা-রূপা মজুদ করা এবং তা থেকে খোদার হক (যাকাত) আদায় যারা করে না তাদেরকে ধমক দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা, এই আহলি কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধনমাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা খোদার পথে খরচ করে না। একদিন অবশ্যই হবে যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে তার দ্বারাই সেই লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে চিহ্ন দেওয়া হবে - -এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। লও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।" (তওবাঃ ৩৪-৩৫)

বুখারী শরীফে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তার যাকাত দেয়নি তার জন্য তার সম্পদ কিয়ামতের দিন একটি বিষধর সাপ হিসেবে পেশ করা হবে। তার বিষ হবে অত্যন্ত মারাত্মক। সাপটিকে তার গলায় জিঞ্জির হিসেবে লটকিয়ে দেওয়া হবে।

অতঃপর সে তার দু' চোয়ালে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে যে, আমি তোমার সেই সম্পদ। এরপর নবী করিম (সঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ

"যে সব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহদানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে এই কৃপণতা তাদের পক্ষে ভালো...। এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে কিয়ামতের দিন তা–ই তাদের গলার রশি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার খোদার জন্য আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।"

দুনিয়ার শাস্তি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখনই মানুষেরা যাকাত প্রদান বন্ধ করেছে তখনই আল্লাহতায়ালা তাদেরকে বুভুক্ষা এবং দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করেছেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, যখন কোন জাতি নিজের মালের যাকাত প্রদান বন্ধ করে তখনই আসমানী রহমত বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি তাদের মধ্যে চতুস্পদ জন্তু না থাকে তাহলে তাদের উপর আর কোন সময়ই বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় না। এ কথার সারমর্ম হলো, যদি সম্পদের মধ্য থেকে যাকাত বের করা না হয় এবং তা সেই সম্পদের মধ্যেই থাকে তাহলে এই আবদ্ধ যাকাত সেই সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।

আল্লাহ প্রদত্ত এইসব শাস্তি ছাড়াও আরও এক ধরনের ইহলৌকিক শাস্তি রয়েছে। এই শাস্তিকে আইনগত এবং শরীয়তের শাস্তি বলা হয়।ইসলামী সমাজে এই শাস্তির বিধান জারি করা নেতৃবৃন্দের দায়িত্বাধীন। এই শাস্তি প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহর (সঃ) যাকাতের হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তি প্রতিদান ও সওয়াবের নিয়তে যাকাত আদায় করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং যে আদায় করে না আমরা তার থেকে যাকাতও আদায় করবো এবং তার অর্ধেক মাল নিয়ে নেব। এটা আমাদের রবের তরফ থেকে আরোপিত জরিমানা হবে। এই জরিমানার মধ্য থেকে আহলে মুহাম্মাদের জন্য কোন বস্তু জায়েজ হবে না।

এই হাদীস অনুসারে যারা যাকাত প্রদান করে না তাদের মালের অর্ধেক সরকারী অধিকার হিসেবে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া যায়। এটা এক ধরনের সম্পদগত শাস্তি। সমকালীন শাসক প্রয়োজনের সময় এই শাস্তি দিতে পারেন। যাতে তিনি যাকাত অনাদায়ীকারীকে সঠিক পথে আনতে পারেন। এই শাস্তি কোন আবশ্যিক বা স্থায়ী শাস্তি নয়। বরং এটা একটি হুঁশিয়ারমূলক শাস্তি। মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কদের সঠিক রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতেই এই শাস্তি প্রদান করা হয়। যাতে তারা যাকাত অস্বীকারকারীদের ধ্যান–ধারণা পরিশুদ্ধির জন্য এই শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উপরন্তু মুসলিহাত ও প্রয়োজন অনুসারে নেতৃবৃন্দের জন্য যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে আটক ও বন্দী করাও বৈধ এবং তাদের শারীরিক শাস্তিও দেওয়া যায়।

সর্বোপরি ইসলাম যাকাত অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে নিয়ে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পুরাদস্তুর যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় তিনি এই মশহুর উক্তি করেছিলেন, "আল্লাহর কসম, যে নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত মালের হক। খোদার রাস্তায় তারা যদি আমাকে এক উক্কালও না দেয় --যা তারা রাসুলুল্লাহকে (সঃ) দিত তাহলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।"

আল্লামা ইবনে হাজম বলেছেনঃ যার ওপর যাকাত ফরজ হয়েছে তার সম্পর্কে নির্দেশ হলো --সে দিতে চাক বা না চাক তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা যদি সে যাকাত না দেয় তাহলে সে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে বলে মনে করতে হবে। আর সে যদি প্রথম থেকেই যাকাত ফরজ হওয়াকেই অস্বীকার করতে থাকে তাহলে সে মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে। সে যদি যাকাত লুকিয়ে রাখে তাহলে সে গুনাহর কাজ করে। অতএব, তাকে শাস্তি প্রদান অথবা হত্যা করা সমকালীন শাসকের ওপর ওয়াজিব। হয় সে যাকাত আদায় করবে অথবা সে মারা গিয়ে চিরকালের জন্য আল্লাহর লা'নতের মুসতাহিক হবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো অন্যায় কাজ করতে দেখে তাহলে শক্তি থাকলে তাকে স্বহস্তে তা প্রতিরোধ করবে। বস্তুতঃ যাকাত আদায় না করাও গর্হিত কাজ। এ জন্য তা রোধ করাও প্রত্যেক শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান লোকদের ওপর ফরজ।

যাকাতের গুরুত্ব

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত এবং নবীর (সঃ) হাদীস যাকাত কেমন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব তার প্রমাণ বহন করে। এটা কোন সাধারণ ধরনের ওয়াজিব নয়। বরং এটা সেই পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ যার ওপর ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত। আর এও সবার জানা যে, যাকাত ইসলামের পাঁচ রোকনের অন্যতম। এই রোকনের ব্যাপারে নির্বিশেষে সবাই উল্লেখ করেছেন। যাকাত ফরজ হওয়ার প্রশ্নে কোন দলিলের প্রয়োজন নাই। কুরআনের আয়াত,রাসুলের (সঃ) হাদীস এবং উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কতিপয় মুহাক্কিক আলেম বলেছেন, কুরআন, সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মাহ যেমন যাকাত ফরজ প্রমাণিত করেছে তেমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও যাকাত ফরজ বলে মনে করে। এই প্রশ্নে তারা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

১) যাকাত আদায় এ জন্যে ওয়াজিব যে তাতে দুর্বলের সাহায্য হয়। কপর্দকহীন বা বিত্তহীন তাতে উপকৃত হয়। এবং কোন দুর্বল ব্যক্তিকে যাকাত এমন পর্যায়ে এনে দেয় যে, সে আল্লাহর ফরজকৃত বস্তু সমূহকে অর্থাৎ তাওহীদ এবং ইবাদতকে আদায় করতে পারে। আর এটাই নিয়ম যে, কোন ফরজ জিনিস আদায়ের মাধ্যমে ফরজ হয়ে থাকে।

২) যাকাত আদায়কারীকে গুনাহর অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। তার চরিত্রকে পাক-পবিত্র করে। তার মধ্যে উদারতা ও লোভ-লালসা পরিত্যাগের গুণাবলী সৃষ্টি করে। যে অন্তর প্রকৃতিগতভাবে ধন-সম্পদের লালসায় পরিপূর্ণ হয় যাকাত আদায়ে সেই অন্তরও উদার এবং দানশীল হয়ে উঠে। আমানত আদায় ও হকদারের নিকট তাদের হক পৌছানোর প্রশ্নে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আল্লাহতায়ালার এই ঘোষণায় এইসব জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে "খুজ মিন আমওয়ালিহিম ছাদাকাতান তুতহিরহুম ওয়া তুজাককিহিম বিহা" -অর্থাৎ তাদের সম্পদ থেকে একটি অংশ ছাদকা হিসেবে আদায় করে তাদের পাক-পবিত্র করো।"

৩) আল্লাহতায়ালা বিত্তশালীদেরকে ধনবান বানিয়ে তাদেরকে নিজের ইনয়াম দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত ও মৌলিক চাহিদা থেকে অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে ফজিলত দিয়েছেন। তারা গৌরব ও নিয়ামতের আধিক্যে শান-শওকতের জীবন পরিচালনা করছে। এ জন্য নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বিবেক ও শরীয়ত উভয় মতেই ফরজ। যাকাত আদায় করা নিয়ামতের শোকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরই নামান্তর। এজন্য যাকাত আদায় করা ফরজ। ইসলামী অনুশাসনে যাকাতের নির্ধারিত স্থান অনুসারেই আলেমরা রায় দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে না এবং তা ফরজ হওয়াকে অস্বীকৃতি জানাবে সে কাফের। সে ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়।

ইবনে কুদামাহ বলেছেন, অজ্ঞতাবশতঃ কোন ব্যক্তি যাকাত অস্বীকারকারী হতে পারে। হয়ত সে নতুন মুসলমান হয়েছে, যাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে জানতে পারেনি। অথবা সে শহর থেকে দূরে কোন জঙ্গলে লালিত-পালিত হয়েছে। পরে সে যাকাত ওয়াজিব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। তাহলে এ ধরনের লোককে কাফের বলা যাবে না। কেননা সে মা'জুর মানুষ। কিন্তু যাকাত অস্বীকারকারী যদি মুসলমান হয় এবং কোন ইসলামী রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে বসবাস করে তাহলে সে মুরতাদ হবে। তার ওপর মুরতাদের হুকুম জারী হবে। তাকে তিনবার তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে। নচেৎ তাকে কতল করতে হবে। কেননা যাকাত ফরজ হওয়ার প্রমাণাদি ও দলিল কুরআন, সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে জ্ঞানী-গুণীদের

মধ্যে বসবাস করে থাকে তার নিকট কুরআন ও সুন্নাহর এই সব প্রমাণাদি গোপন থাকতে পারে না। যদি সে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অস্বীকার করে তাহলে সে কিতাব ও সুন্নাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং উভয়কে সে সঠিক মনে করেই অস্বীকার করে।

যাকাতের একটি হক নির্দিষ্ট রয়েছে

ইসলামে যাকাত একটি অধিকার। অথবা বিত্তশালীদের ঘাড়ে দুর্বল এবং হকদার শ্রেণীর ঋণ। এমনিতেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হক রয়েছে অর্থাৎ যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ। যারা যাকাত গ্রহণ করে তারা এই পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। এই হক নির্দিষ্টকারী হলেন সেই সত্তা যিনি নিজের পরহেজগার এবং নেককার বান্দাহদের সম্পর্কে বলেছেন, ওয়াফি আমওয়ালিহিম হাক্‌কুন লিস্‌ সায়িলি ওয়াল মাহরুম (তাদের সম্পদে সাওয়ালকারী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে)। অন্য এক সূরায় বেহেশতে ইজ্জত ও সম্মানের হকদার নেক বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেন ঃ ওয়াল্‌লাজিনা ফি আমওয়ালিহিম হাক্‌কুম্‌ মা'লুমুন লিস্‌সায়িলি ওয়াল মাহরুম (সেই সব ব্যক্তি যাদের সম্পদে সাওয়ালকারী এবং বঞ্চিতদের একটি পরিজ্ঞাত ও নির্দিষ্ট হক রয়েছে)।

এই অধিকার নির্দিষ্ট হওয়াটা কোন আশ্চর্যের বস্তু নয়। কেননা আমরা যখন জানি যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের ওপর মানুষের মালিকানার তাৎপর্য কি। ইসলামের দৃষ্টিতে এই মতবাদকে খিলাফতের মতবাদ বলা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন এবং এই আয়াত সেই মতবাদের প্রমাণ দেয়ঃ "ওয়া আনফিকু মিম্মা জায়ালাকুম মুসতাখলাফিনা ফিহি" (এবং খরচ কর সেই সম্পদ থেকে যাতে আমরা তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছি)।

জানা গেল যে, মানুষ সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। সম্পদের প্রকৃত মালিক সৃষ্টিকর্তা এবং সে তো রিযিকদাতার তরফ থেকে সম্পদের আমানতদার মাত্র। মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য হলো, সে সেই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিককদাতার নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেবে এবং তাঁর হক স্বীকার করবে। সম্পদের যিনি প্রকৃত মালিক তিনিই কম-বেশী পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

যাকাত একটি নির্দিষ্ট হক। আল্লাহ পাক ফকির-মিসকিন এবং অন্যান্য হকদারদের জন্য সমাজের বিত্তবানদের ওপর এটাকে ফরজ করেছেন। তাহলে তার দাবী হলো, এক বছর অথবা তার থেকে বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তা মওকুফ করা যাবে না। বরং তা আদায় করে হকদারদের কাছে পৌছাতে হবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাযম বলেছেনঃ "যার সম্পদে দুই বা ততোধিক যাকাত জমা হয়ে

গেছে এবং সে যদি জীবিত থাকে তাহলে প্রতি বছরে তার ওপর যত যাকাত ওয়াজিব সেই হিসেবে সব বছরের যাকাত তার কাছ থেকে আদায় করতে হবে। যাকাত আদায় না করার কারণ যদি নিজের মাল লুকিয়ে ফেলা হয় অথবা সরকারের তরফ থেকে যাকাত আদায়কারী তার কাছে না গিয়ে থাকে অথবা অজ্ঞতার ফলে যদি যাকাত আদায় না করে থাকে তাহলেও যাকাত আদায় করতে হবে। এই যাকাত নগদ অর্থ, ক্ষেত-খামার এবং আসবাব-পত্র সকল কিছুর ওপরই পড়বে, তাতে তার সব সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হোক বা না হোক। অথবা যাকাতের উসূল মুতাবেক নিসাব থেকে কম হোক। পুরো যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত সে করজও আদায় করতে পারবে না।

সরকার যে ট্যাক্স আদায় করেন তা দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় করা না হলে মওকুফ হয়ে যায়। অথবা কয়েক বছর অতিবাহিত হলে সেই ট্যাক্স কম-বেশী হয়। কিন্তু যাকাত মুসলমানের ওপর ঋণ হিসেবে অবশিষ্ট থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা আদায় না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে দায়গ্রস্ত থাকে। তার ইসলাম ও ঈমান সঠিক ও সত্য বলে পরিগণিত হতে পারে না। আল্লামা ইবনে হাযমের মত অনুসারে অন্যান্য ঋণের চেয়ে যাকাতের নিজস্ব বৈশিষ্ট অগ্রগণ্য। যাকাত আল্লাহর, গরীবের এবং সমগ্র সমাজের হক।

এমনিভাবে ধনী মারা গেলেও তার সম্পদের ওপর থেকে যাকাত মওকুফ হয় না। সে যদি ওছিয়ত না করে তা সত্ত্বেও যাকাত অবশিষ্ট থাকে। যাকাত মৃতের সম্পদ থেকে পৃথক করে নিতে হবে। আতা, হাসান, যাহরী, কাতাদাহ, ইসহাক, আবু ছাওর, এবং ইবনে মুনযারও এই মতের অনুসারী। আর এই মত সঠিকও। কেননা কুরআন মজিদে বর্ণিত খোদা পাকের ফরমানের সাথে এই মতের মিল রয়েছে। "মিম বা'দি ওয়াছিয়্যাতিন ইউছা বিহাইওদাইনিন" --মৃতের সম্পদ সেই সময় বন্টন করা হবে যখন ওছিয়ত পূরণ করা হবে এবং মৃতের ঋণ আদায় করা হবে। আল্লাহর এই নির্দেশে সব ধরনের ঋণই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাযমের মত অনুসারে যাকাতও এক ধরনের ঋণ। কুরআনের দলিল অনুযায়ী আল্লাহ, মিসকিন এবং ফকিরদের জন্যই এই ঋণ। আল্লামা ইবনে হাযম যাকাতের ঋণকে অন্যান্য ঋণের থেকে অগ্রগণ্য মনে করেন। মুসলিম শরীফের এই হাদীস থেকে তিনি দলিল উপস্থাপন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "এক ব্যক্তি রাসুলের (সঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, আমার আম্মা মারা গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার ওপর এক মাসের রোজা ওয়াজিব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে এই ঋণ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন,যদি তোমার মায়ের ওপর কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বললো, হাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ আদায় আরো বেশী জরুরী।" এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, যার ওপর যাকাত ফরজ, তার মৃত্যুও তার যাকাত

মওকুফ করতে পারে না যদি সে আল্লাহর পথে জিহাদে রত অবস্থায় শহীদও হয়ে যায় তবুও যাকাত মওকুফ হয় না। মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "ঋণ ছাড়া শহীদের সব গুণাহ মাফ করে দেয়া হয়।" এ থেকে সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি যদি যাকাত আদায়ে বিলম্ব করে এবং এই অবস্থায় আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যায় তাহলে ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) প্রভৃতির মতে সে যাকাতের দায় থেকে মুক্ত হবে না।

জানা গেল যে, ইসলামে যাকাত একটি প্রতিষ্ঠিত হক। যদি তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আদায় করা না হয় অথবা যার ওপর তা আদায় করা ফরজ তার যদি মৃত্যুও হয় তাহলে এই হক মওকুফ হবে না। বরং মৃতের সম্পদ থেকে তা আদায় করতে হবে এবং এই হক অন্যান্য প্রত্যেক হক অথবা ঋণের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করতে হবে। এমনিভাবে যাকাত বর্তমান যুগের সরকারী ট্যাক্স থেকেও অগ্রগামী হয়ে গেল। এই ট্যাক্স সরকারী কর্মকর্তাকে ঋণগ্রস্তের সম্পদের ওপর বিশেষ এখতিয়ার দান করে। এই এখতিয়ার বলে অন্যান্য ঋণের চেয়েও সরকারী ট্যাক্সকে অগ্রগণ্য মনে করে। যদি ঋণ গ্রহণকারী নিজের সম্পদ থেকে কোন ধরনের ব্যয় নির্বাহের প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সরকারী কর্মকর্তা নিজের মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

সমাজতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি এবং যাকাতের পার্থক্য

ইসলামে যাকাত হলো 'জ্ঞাত হক'। সেই সত্তা এই হক নির্ধারণ করেছেন যিনি স্বয়ং আল্লাহ। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সম্পদ দান করেছেন। সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহীরা যখন দারিদ্র্য ও বুভূক্ষার কথা উত্থাপন করে, তখন সীমা লংঘন করে এবং ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি করে থাকে। তারা গরীবকে বলে থাকে যে "তোমাকে লুটে নেওয়া হয়েছে এবং তোমার লুণ্ঠনকারী হলো ধনী"। অতঃপর তারা গরীবকে লোভ দেখিয়ে উত্তেজিত করে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে ধনীর সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ব্যাপার হলো, প্রত্যেক গরীবকে লুণ্ঠন করা হয়নি এবং প্রত্যেক ধনীই চোর অথবা লুটেরা নয়। আর প্রত্যেক ফকিরের অপরাধ ধনীর কাঁধে নিক্ষেপ করা যায় না। গরীবদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা স্বয়ং নিজেদের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। আবার অনেকে আছে যাদের জন্য দায়ী অন্যরা।

সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহীরা বলে থাকেনঃ "ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি অনুমানভিত্তিক চুক্তি (Approximate Contract) থাকে। এই চুক্তি কোন কাগজে লিখিত চুক্তি নয় বরং পণ্যের আকৃতিতে লিপিবদ্ধ থাকে। গরীব কাজ করে আর ধনী কামাই করে। ধনীর কামাই গরীবের কাজের কারণেই হয়। তারা উভয়ে একে অপরের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হয় যেমন পুঁজি ও শ্রম অত্যাবশ্যক। যখন অর্থনৈতিক

অবস্থা এমন হয় যে, তাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয় তখন ধনীর জিম্মায় গরীবের এক ধরনের ঋণ আরোপিত হয় এবং গরীব তা আদায়ের জন্য ধনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।" আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদের কিছু কথা ঠিক বলেও মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই মতবাদ গোমরাহির মতবাদ এবং গরীবের অন্তরে ধনীর বিরুদ্ধে ক্রোধের আগুন প্রজ্জলিত করা হয়। এতে ধনীর জন্য এই হুমকি রয়েছে যে, সেই আনুমানিক চুক্তির নামে তার সম্পদ জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ এবং সেই অনুমানভিত্তিক অনৈসলামী মতবাদের সার্বিক তুলনা করা হলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামী মতবাদ বাস্তব ও ইনসাফ ভিত্তিক এবং অন্য মতবাদ ক্রোধ ও ভারসাম্যহীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী মতবাদে গরীবের হক এত পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত যাকে 'হক' বলা হয়েছে। একে চুক্তি বলা হয়নি। ইসলামে এই হক 'জ্ঞাত', 'অজ্ঞাত' ও অনুমানভিত্তিক নয়। ইসলামে যাকাতকে আল্লাহর হকসমূহ থেকেও একে হক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, এটা এক মানুষের নিজের ভাইয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হক। আল্লাহর হক এই ভিত্তিতে যে তিনি মানব সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তার রুজীও সরবরাহ করেন। তিনি ধন-সম্পদ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশেই সকল সৃষ্ট জীব মানুষের খিদমত করে চলেছে। এজন্যে মানুষকে তার শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ স্বয়ং এই শোকরের পন্থাও নির্ধারণ করেছেন। তাহলো তাঁর স্বচ্ছল বান্দাহ মুখাপেক্ষী বা গরীবকে সাহায্য করবে। এটা মানুষের হক এই ভিত্তিতে যে, ধনী ও দরিদ্র উভয়েই পরস্পর ভাই ভাই। এজন্য গরীব ও মুখাপেক্ষী মানুষের নিজের স্বচ্ছল ভাইয়ের সম্পদে আবশ্যিক এক অধিকার রয়েছে যা আদায় করা উচিত।

ধনীর সম্পদে ফকির ও বঞ্চিতদের হকের কি সম্পর্ক এবং কেন, সে ব্যাপারে ইমাম রাজী (রঃ) যা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা উত্তম হবে।

প্রথম কথা হলো, কোন মানুষ যদি প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ লাভ করে তাহলে সেই সম্পদ নিজের কবজায় রাখার বেশী হকদার সে। কেননা, অন্যান্য মুখাপেক্ষীদের মত তারও সম্পদ প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে সম্পদের মালিকের হক বা অধিকার অন্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য। অবশ্য সম্পদ যখন তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হয় এবং অন্য মুখাপেক্ষী মানুষও বর্তমান থাকে তখন দুটি কারণ এমনভাবে একত্রিত হয় যা একে অপরের বিপরীত। সম্পদের মালিকের ব্যাপার হলো সে সম্পদ লাভে পরিশ্রম করেছে। এজন্য তার সম্পদের সাথে একটি আন্তরিক সম্পর্ক থাকে। আর গরীবের ব্যাপার হলো তার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য তারও সম্পদের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক থাকে। যখন এই দুই বিপরীতমুখী কারণ একত্রিত হয় তখন আল্লাহর হিকমতের দাবী হলো উভয় কারণের প্রত্যেক কারণের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুতঃ বলা

হবে যে, মালিকের যেহেতু সম্পদের ওপর অর্জনের অধিকার এবং অন্তরের সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে ফকির ও বঞ্চিতদের শুধু প্রয়োজন পূরণের অধিকার রয়েছে। সে জন্যে আমরা মালিকের হককে এতদূর পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেবো যাতে সে সম্পদের বেশীর ভাগ অংশের ওপর অধিকার পেতে পারে এবং গরীবকে তার একাংশ আদায় করে দিতে হবে যাতে উভয়কেই যথাসম্ভব নিরুদ্বিগ্ন রাখা যায়।

দ্বিতীয় হলো,যদি কোন ধনবান ব্যক্তি নিজের প্রকৃত প্রয়োজন থেকে বেশী সম্পদ আটকে রাখে এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা পূরণ করা না যায় তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। এজন্য আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, সম্পদের এক অংশ গরীবদেরকে দিয়ে দিতে হবে। তাতে আল্লাহর হিকমত জীবন্ত থাকবে।

তৃতীয় কথা হলো, ফকির এবং মিসকিনরা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। বিত্তবান ও ধনীরা হলো আল্লাহর খাজাঞ্চী। কেননা তাদের নিকট যে সম্পদ রয়েছে তা সবই আল্লাহরই। আর এটাই বিবেকের কথা যে কোন মালিক তার কোষাধ্যক্ষকে বলে যে আমার সম্পদের কিছু আমার পরিবারের গরীব মিসকিনকে দিয়ে দাও।

যাকাত ইনসাফের সাথে আরোপ করা হয়েছে

ইসলাম সম্পদের ওপর যাকাত নির্ধারণে অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কাজ করেছে। বিত্তবানদের পরিশ্রমের প্রতিও এতে খেয়াল রাখা হয়েছে। আবার গরীব ও বঞ্চিতদের হক বা অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বিত্তশালীদের সাথে অন্যায় বা বেইনসাফী এবং ফকিরদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়নি। ইবনে কাইয়েম তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদ' –এ যাকাত প্রসঙ্গে নবী করিমের (সঃ) নির্দেশ শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেনঃ যাকাত প্রশ্নে তাঁর কর্মপদ্ধতি সার্বিক দিক থেকে পূর্ণ ছিল। সময়, মর্যাদা পরিমাণ এবং যারা যাকাত পাবেন সকল দিক থেকেই তা ছিল পরিপূর্ণ। এতে সম্পদের মালিক ও গরীব–মিসকিন উভয়ের প্রয়োজনকে পুরোপুরি খেয়াল রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাক যাকাতকে সম্পদ ও সম্পদের মালিকের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম বানিয়েছেন। বস্তুতঃ তা শুধু ধনীদের ওপরই ওয়াজিব করেছেন। এই কারণেই যিনি যাকাত আদায় করেন তিনি নিয়ামতের পতন থেকে মাহফুজ থাকেন।বরং তার সম্পদে বরকত ও প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এবং মুসিবত থেকে তা রক্ষা পায়। এমনিভাবে যাকাত আদায় করা যেন আদায়কারীর জন্য এক ধরণের বীমা ও দূর্গ হিসেবে পরিগণিত হয়।"

যাকাত বছরে মাত্র একবার ফরজ। উপরন্তু তাকে ফল এবং ফসল পাকার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আর এটাই সবচেয়ে বেশী ইনসাফ ভিত্তিক আইন। কেননা প্রতি মাসে বা প্রতি জুময়ায় তা ফরজ করা সম্পদের মালিকের জন্য ছিল ক্ষতির ব্যাপার। অন্যদিকে জীবনে শুধু একবার ফরজ করাটা ছিল মিসকিনদের অধিকার প্রশ্নে এক

আঘাত স্বরূপ। বস্তুতঃ বছরে একবার ফরজ করাটাই বাস্তবত সবচেয়ে বেশী ইনসাফের ব্যাপার, আবার সম্পদ লাভের জন্য সম্পদের মালিকের প্রচেষ্টা ও মেহনতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকাতের পরিমাণেও তারতম্য করা হয়েছে, সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ করে এক স্থানে একত্রিত সম্পদ পেয়ে যায় (যেমন লুক্কায়িত সম্পদ) তাহলে তার ওপর এক পঞ্চমাংশ যাকাত ফরজ করা হয়েছে এবং সেজন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্তযুক্ত করা হয়নি। বরং যখনই এ ধরনের সম্পদ পাওয়া যাবে অমনি এক পঞ্চমাংশ আদায় ওয়াজিব হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে ফল এবং ফসল। এতে মানুষের সম্পদ লাভের জন্য অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়। এর উপর লুক্কায়িত সম্পদ থেকে অর্ধেক অর্থাৎ এক দশমাংশ যাকাত আরোপ করা হয়েছে। কেননা ভূমি কর্ষণ, সেচ প্রদান, বপণ প্রভৃতিতে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়। এত গেল সেইসব ফসল ও বাগানের সাথে সংশ্লিষ্ট যাতে প্রকৃতিগতভাবে সেচের কাজ চলে। এতে মানুষকে পানি প্রভৃতি ক্রয় এবং ইত্যাদি খননের পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু যেসব জমিতে সেচ কাজের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে হয় অর্থাৎ তাকে নদী–নালা অথবা কুপ থেকে সেচ কাজ করতে হয়; তাহলে এই সব ফসলের ওপর দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ কুড়ি ভাগের এক ভাগ যাকাত ফরজ করা হয়েছে। যখন ধন সম্পদের প্রবৃদ্ধি সম্পদের মালিকের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ এ জন্যে তাকে কখনো সফরের কষ্ট ভোগ করতে হয়। আবার কখনো বা সম্পদ লাভের মাধ্যমে (অর্থাৎ দোকান, কারখানা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সংগঠন) ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির পরিশ্রম করতে হয় তখন এই অবস্থায় সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সর্বশেষ পন্থার কাজে ফসল এবং ফলের উৎপাদনে বেশী বেশী পরিশ্রম করতে হয় ও ফসল এবং ফলের উৎপাদনে বাণিজ্যিক তুলনায় উন্নতিও বেশী হয়। এজন্য বাণিজ্যিক সম্পদের তুলনায় ফসল এবং ফলে বেশী যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং যে জমিতে বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয় তার ফসল উৎপাদন অন্যান্যভাবে সেচ দানের চেয়ে বেশী হয়। এক স্থানে একত্রিত সম্পদ অর্থাৎ লুক্কায়িত সম্পদ পাওয়া গেলে আর এই ধরনের সম্পদ প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশী সহজ ও লাভজনক হয়। অতঃপর যেহেতু সম্পদের প্রত্যেক পরিমাণের মালিক এ ধরনের যোগ্য হয় না যে সে অন্যকে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য সম্পদের এক নির্ধারিত পরিমাণ নিছাব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ মাল কারোর থাকলেই তার উপর যাকাত ফরজ হয়। এতে সম্পদের মালিকের সাথে বাড়াবাড়িও হয় না, আবার ফকির মিসকিনদের প্রয়োজনও পূরণ হয়।

আল্লাহ পাক স্বয়ং ছাদকাহকে ৮ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই আটভাগ আবার দু'ধরনের মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ যারা কোন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে

ছাদকা গ্রহণ করে। এই প্রয়োজনের কমবেশী আবার নজরে রাখা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে ফকির, মিসকিন, গোলাম এবং মুসাফির প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ যারা উপকারের জন্য ছাদকাহ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে রয়েছে যাকাত প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মচারী, মুয়াল্লেফাতুল কুলুব, নিজেকে সংশোধনের জন্য ঋণ আদায়কারী এবং আল্লাহর পথে মুজাহিদ প্রভৃতিরা। যদি যাকাত ও ছাদকাহ গ্রহণকারী না থাকে এবং ছাদকাহ প্রদানে মুসলমানদের কোন উপকার না হয় তাহলে এমন ব্যক্তির যাকাতে কোন অংশ নেই।

যাকাত প্রশ্নে সরকারের দায়িত্ব

ওপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, যাকাত একটি নির্ধারিত হক। আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে এটা ফরজ করা হয়েছে। এটা এমন হক নয় যা মানুষের অনুমোদনের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। আল্লাহ এবং পরকালের ওপর যারা বিশ্বাস করে তারা এটা আদায় করবে এবং যাদের পরকালের ওপর বিশ্বাস কিছুটা কম ও আল্লাহ সম্পর্কে ভীতিও কম--তারা এটা আদায় করবেনা, এমনটি নয়। এটা কোন ব্যক্তিগত ইহসান নয় বরং এটা একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সরকারের তত্ত্বাবধানে এটা চলে এবং একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এটা চালায়। যাদের ওপর যাকাত ফরজ তাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানটি যাকাত আদায় করে এবং তাদেরকে প্রদান করে যাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

কোরআনী দলিল

যাকাত সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট দলিল হলো আল্লাহ পাক যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ তত্ত্বাবধানকারীকে একত্রে এবং পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে 'আমেলিনা আলাইহা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাকাতের সম্পদেই তাদের অংশ রাখা হয়েছে। অন্য মাধ্যম থেকে তারা নিজের বেতন নিক সেই মুখাপেক্ষীও তাদের রাখা হয়নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে যাতে তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেনঃ

"ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারায়ি ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়ালমুআললিফাতি কুলুবিহিম ওয়া ফির রিকাবি ওয়াল গারিমিনা ওয়াফি সাবিলিল্লাহি ওয়াবনিস সাবিলি ফারিদাতাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিম।"

"ব্যাস, ছাদকাহ ফকির মিসকিন এবং আমেলিনদের জন্য। --যারা এই ছাদকাহ আদায় এবং বন্টনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এবং তাদের জন্য যাদের অন্তরে মুহাব্বত

সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে এবং গোলাম আজাদ করা, ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরের পথের খরচ হিসেবে (খরচ হওয়া প্রয়োজন) ও আল্লাহ্ জানেন এবং বিজ্ঞ।

আল্লাহর কিতাবের এই সুস্পষ্ট দলিলের পর কোন ব্যাখ্যা ও ঢিলেমী এবং চিন্তা–ভাবনার কোন অবকাশ নেই। বিশেষ করে এরপর তো আর কোন অবকাশই থাকতে পারে না যখন উল্লিখিত আয়াতে যাকাত ও ছাদকার হকদারের শ্রেণী ও সীমা নির্ধারণকে "আল্লাহর তরফ থেকে ফরজ" বলা হয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে আরোপিত সেই ফরজকে বাতিল করার স্পর্ধা এখন কে রাখে ? আল্লাহ্ পাক সূরায়ে তওবাতেই যাকাতের খরচের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

"খুজ মিন আমওয়ালিহিম ছাদাকাতান তুতাহহিরহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা। ওয়া ছাললি আলাইহিম ইন্না ছালাতাকা সাকানুল লাহুম।" "তাদের সম্পদ সমূহ থেকে ছাদকা নিয়ে নাও। যাতে তিনি পবিত্র করে দেন তাদেরকে এবং পরিষ্কার করে দেন তাদেরকে ছাদকার মাধ্যমে। এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির কারণ হয়।"

এই আয়াতে উল্লিখিত ছাদকার অর্থ যাকাত। এটা মুসলমানদের সম্মিলিত রায়। এখানে নবী করিম (সঃ) এবং যিনি পরবর্তীতে মুসলমানদের নেতা হবেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

নবীর সুন্নাত

বুখারী ও মুসলিম শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থে যে মশহুর হাদীস ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তাতে নবী করিম (সঃ) হজরত মুয়াজকে (রাঃ) ইয়েমেন পাঠানোর সময় তাকে বলেছিলেন, "জেনে রেখ, আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের ওপর এক ধরনের ছাদকা ফরজ করেছেন। এই ছাদকা তাদের বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে ফকির এবং মিসকিনদের দেওয়া হয়। তুমি ধনীদেরকে তা আদায়ের নির্দেশ দেবে। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের ভালো ও উত্তম মালই নেবে না এবং মজলুমের দোয়াকে ভয় করো। কেননা মজলুম এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" এই হাদিসের যে অংশকে আমরা দলিল হিসেবে পেশ করতে চাই তাহলো নবী করিমের (সঃ) এই ফরমান সেই ফরজকৃত ছাদকা এবং যাকাত সম্পর্কিত যা বিত্তবানদের কাছ থেকে নিয়ে ফকির উম্মাহদের দেওয়া হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে একজন আদায়কারী যাকাত আদায় করে এবং একজন বন্টনকারী তা গরীব ও মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে। যে ব্যক্তি এই ফরজ আদায় করবে তার অনুমোদনের এখতিয়ারের ওপরে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজর

'ফাতহুল বারী' (শরাহ বুখারী) গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন "হযরত আলী (রাঃ) এই হাদিস থেকে দলিল দিয়ে বলেছেন সমকালীন শাসকই যাকাত আদায় এবং তা ব্যয় ও বন্টনের জিম্মাদার। এই কাজ সে স্বয়ং করুক অথবা নিজের কোন নায়েবের মাধ্যমে করাক। এবং যে ব্যক্তি যাকাত দানে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে তা আদায় করতে হবে।

কাওলী হাদীসে এসব যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, বাস্তব সুন্নাত ও ঐতিহাসিক দিক থেকে তা আরও শক্তিশালী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। রাসূলের (সঃ) যুগে এবং তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের কালে এটাই কার্যকরী হয়েছে।

এজন্য আলেমরা বলেছেন, সমসাময়িক শাসকের ফরজ হলো সে যাকাত আদায়কারীদেরকে প্রেরণ করবে। কেননা নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন যাকাত আদায়কারীদের প্রেরণ করতেন। বস্তুতঃ এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা মালদার বটে কিন্তু মালদার হওয়া অবস্থায় তাদের ওপর কি কি ওয়াজিব তা তারা অবগত নয়। আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা কৃপণ এবং বখিল। এজন্য তাদের কাছে যাকাত আদায়কারীদের প্রেরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায়ে যাকাত আদায়কারীদের সহযোগিতা করা জাতির বিত্তশালীদের আবশ্যিক কাজ হিসেবে পরিগণিত। তাদের ওপর যত যাকাত ওয়াজিব তা আদায় এবং যাকাতের মাল থেকে কোন বস্তু তারা লুকিয়ে রাখবে না। রাসূলের (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের এটাই নির্দেশ।

জাবের ইবনে আতিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেন, "তোমাদের কিছু সওয়ার আসবে যা তোমাদের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদেরকে স্বাগত জানাবে এবং তারা যা কিছু করতে চায় তা করতে দেবে। যদি তারা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কাজ করে তাহলে এটা তাদের জন্য ভালো হবে। যদি তারা জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে তাহলে তারা কৃতকর্মের ফল স্বয়ং পাবে। তাদের খুশী এবং সন্তুষ্টির অর্থ হলো তোমরা যাকাত পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছ এবং তাদের জন্য উচিত হবে তোমাদের জন্য দোয়া করা।"

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি নবী করিম (সঃ)কে বললোঃ যদি আমি আপনার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত দিয়ে দিই তাহলে কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট দায় মুক্ত হবো? তিনি বললেন, হাঁ।

যদি তুমি আমার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় কর তাহলে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) নিকট দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং গুণাহর যোগ্য সেই ব্যক্তি হবে, যে তাতে পরিবর্তন করবে।"

সাহাবায়ে কিরামের ফতওয়া

ছাহাল ইবনে আবু ছাহাল (রাঃ) নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, "আমার কাছে কিছু সম্পদ জমা হয়ে গেল। আর এই সম্পদ যাকাতের নিছাব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আমি সায়াদ আবনে আবি ওকাছ, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি নিজেই তা বন্টন করে দেব অথবা সমসাময়িক শাসকের হাওয়ালা করে দেব? সবাই আমাকে সমসাময়িক শাসকের কাছে হাওয়ালা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং কেউই এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন কথা বলেননি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি তাদেরকে বললাম ঃ "সমসাময়িক শাসক যা করে আপনারা তা জানেন। (এই ঘটনা বনু উমাইয়া যুগের)

তাহলে কি আমি এমন লোকদেরকে নিজের যাকাত দিয়ে দিব?

তারা সবাই বললেন, হাঁ দিয়ে দাও।"

এই হাদিস সাঈদ বিন মানসূর নিজের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, "নিজের যাকাত শাসকের হাওয়ালা করে দাও। তাদের মধ্যে যে তার সঠিক ব্যবহার করবে সে নিজের জন্য ভালো করবে এবং যে তার ভুল ব্যবহার করবে তার শাস্তি সেই ভোগ করবে।"

হজরত মুগিরা বিন শু'বা (রাঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি তায়েফে তার সম্পদ তত্ত্বাবধানকারী এক গোলামকে বললেন তুমি আমার সম্পদের যাকাত এবং ছাদকা কি করো? সে বললো, কিছু ছাদকা নিজেই বন্টন করে দিই আর কিছু সমসাময়িক শাসকের হওয়ালা করে দিই। তিনি বললেনঃ তুমি এ ধরনের অধিকার কোথায় পেলে ? (অর্থাৎ তিনি তাকে নিষেধ করলেন যে, সে যাকাত প্রভৃতিকে নিজে বন্টন না করে) সে জবাব দিলঃ সেই সব ব্যক্তি (যাদেরকে যাকাত দিয়ে থাকি) যাকাতের মাল থেকে জমি ক্রয় করে এবং মহিলাদের বিয়ে করে। তিনি বললেন, তাদেরকে দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদেরকে যাকাত দিতে হবে।

আল্লাহর রাসূলের (সঃ) এই সব ইরশাদ এবং ছাহাবীদের উক্ত সিদ্ধান্তমূলক ফতওয়া থেকে জানা যায় যে, ইসলামী শরীয়তের নীতি হলো মুসলামান সরকার এই দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে যাকাত জমা করবে এবং তা হকদার লোকদের মধ্যে খরচ করবে।

মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ হলো তারা এ ব্যাপারে শাসকদেরকে সহযোগিতা করবে। যাতে যাকাত ব্যবস্থা কায়েম হয়। ইসলামের ভিত্তিসমূহ দৃঢ় হয় এবং মুসলমানদের বাইতুল মাল মজবুত হয়।

এই আইন প্রণয়নের রহস্যাবলী

বলা হয়ে থাকে যে, সব ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ধর্ম ঘুমন্ত অন্তরকে জাগ্রত করবে। মানুষের সামনে পুণ্য ও পরহেজগারীর এক মাপকাঠি সৃষ্টি করবে। অতপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের আকাংখা এবং তাঁর ভীতি অন্তরে সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাবে।বৈষয়িক ও পার্থিব বিষয়াদি চালানোর কাজ তো ক্ষমতাসীনদের কাজ। এটা দ্বীন বা ধর্মের কাজ নয়। এ কথার জবাব হলো, অন্যান্য ধর্মে এটা ঠিক হতে পারে কিন্তু ইসলামে তা কখনোই ঠিক নয়। ইসলাম যেমন আকিদা–বিশ্বাসের নাম তেমনি জীবন ব্যবস্থাও। এটা যেমন নৈতিক ব্যবস্থা তেমন শরীয়তের আইনও। এতে কুরআনও আছে, সুলতানও আছে। ইসলামে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়নি যে, একভাগ কাইসারের অপর ভাগ খোদার। বরং সমগ্র জীবন, পূর্ণ মানুষ এবং সমগ্র সৃষ্টি জীব এক আল্লাহর অনুগত। ইসলাম হেদায়েতের এক পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে এসেছে। উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সমগ্র মানবতাকে একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত না করার নির্দেশের সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম, সমগ্র সমাজের স্বচ্ছলতা এবং জাতিসমূহ ও সরকারসমূহ সত্য ও কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করাও রয়েছে। হেদায়াতের এই পূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে একটি দিক যাকাতও। যাকাত আদায় করা যদিও ব্যক্তির উপর ফরজ কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির উপর ফরজ নয়। বরং তা ইসলামী সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামে যাকাত জমা করা এবং তা সমাজের প্রকৃত হকদার পর্যন্ত পৌছানো সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। একে জনসাধারণের অনুমোদনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তার নিম্নোক্ত কারণ রয়েছে। (ইসলামী শরীয়ত তা থেকে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না)

১– সমাজে এমন লোকও থাকতে পারে যার অন্তর পার্থিব ও নিজের স্বার্থের কারণে মৃতবৎ হয়ে গেছে অথবা তার কোন আত্মিক রোগ দেখা দিয়েছে। যদি ফকির–মিসকিনদের অধিকার বা হক এ ধরনের লোকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ফকির–মিসকিনরা তাদের হক আবশ্যিকভাবে পাবে এমন গ্যারান্টি নেই।

২– ফকির এবং মুখাপেক্ষীরা যদি বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাহলে তার মান–ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা পায় এবং তার অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয় না।

৩– যাকাত বন্টনের বিষয় যদি ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বিলি–ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দেবে। হতে পারে যে, বেশীর ভাগ ধনীই একজন ফকির এবং মুখাপেক্ষীকে যাকাত দিতে থাকবে এবং অন্যান্যকে উপেক্ষা করবে। যাকাত বন্টনের সময় তাদের কথা বেমালুম ভুলেও যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তারা তার চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী।

৪– যাকাতের খরচের খাত শুধু ফকির, মিসকিন এবং মুসাফির পর্যন্তই সীমিত নয়। বরং তার কতিপয় খাত এমন খাত যার সাথে সমগ্র মুসলমানের স্বার্থ জড়িত। এর পরিমাপ কোন ব্যক্তি করতে পারে না। মুসলমানদের জামায়াতের নেতৃস্থানীয়রা এবং আহলে শুরা এইসব খাতের পরিমাপ করতে পারেন। যেমন মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে দেওয়া, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সাজ–সরঞ্জাম প্রস্তুত করা এবং দুনিয়ায় ইসলামের তাবলিগের জন্য মুবাল্লিগ তৈরী করা।

৫– ইসলাম দ্বীনও আবার সরকারও। কুরআনও এবং সুলতানও। এই সুলতান এবং সরকারের জন্যও সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে যা দিয়ে তারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে নিজেদের পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। আর সম্পদ লাভের জন্য মাধ্যমও প্রয়োজন। যাকাত সরকারের কোষাগার অথবা বাইতুল মালের জন্য এক বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী আয়ের মাধ্যম।

যাকাতের বায়তুল মাল

এ থেকে জানা গেল যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি মৌলিক কথা হলো যাকাতের জন্য পৃথক বাজেট থাকতে হবে এবং এ রাজস্ব আলাদা। এই রাজস্ব থেকে শুধু যাকাতের খরচের খাতেই ব্যয় হবে। এটা বিশেষ মানবিক এবং ইসলামী খাত। এই সম্পদকে সরকারের সাধারণ বাজেটের সাথে একত্রিত করা যাবে না। সাধারণ বাজেট অত্যন্ত ব্যাপক। তাতে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। তার রাজস্ব যাকাত ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়। সূরায়ে তওবার যে আয়াতে যাকাতের খরচের খাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, যাকাত জমা ও বন্টনের কাজে নিয়োজিতরা যাকাত থেকেই বেতন গ্রহণ করবে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, যাকাতের একটি স্থায়ী বাজেট থাকবে এবং তার ব্যবস্থাপনায় তা থেকেই ব্যয় করতে হবে। প্রাচীনকাল থেকে মুসলমানরা এই আয়াতের অর্থ এটাই বুঝে আসছে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বাইতুলমালকে চার ভাগে বিভক্ত করে একটি বাইতুল মাল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

১–যাকাতের বিশেষ বাইতুলমাল ঃ এই বাজেটে যাকাত আমদানি, তা একত্রিত করার ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজন অনুসারে তার ব্যয়ের খাতে বন্টন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২–জিজিয়া ও খিরাজ আমদানির বাইতুল মালঃ জিজিয়া এমন এক ধরনের রাজস্ব যা মুসলমানদের মধ্যে বসবাসরত অমুসলিমদের কাছ থেকে এই শর্তে নেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদের কল্যাণ ও অকল্যাণে অংশীদার হবে। যেমন মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত ও অন্যান্য ছাদকা, ঈদুল ফিতরের ছদকা, ইবাদাতে কমবেশী ও গুণাহর কাফফারা প্রভৃতিতে নেওয়া হয়। তেমনি অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া নেয়া হয়।

বস্তুতঃ জিজিয়া নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিমদেরকে সামরিক সার্ভিসে অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের প্রতিরক্ষা এবং হেফাজত করে থাকে। আর খিরাজ এক ধরনের বার্ষিক ট্যাকস যা কোন ভূখন্ডের ওপর তার শক্তি হিসাবে আরোপ করা হয়। যেমন হজরত ওমর (রাঃ) ইরাক প্রভৃতি ভূখন্ডের ওপর আরোপ করেছিলেন।

৩–গনিমত ও লুক্কায়িত সম্পদের বাইতুলমালঃ (কিছু লোক বলেন যে, লুক্কায়িত সম্পদ প্রভৃতি যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা যাকাতের ব্যয়ের খাতে ব্যয় করা যায় না। বস্তুতঃ তারা এ বাইতুলমাল পৃথকভাবে নির্ধারণ করে থাকেন)

৪–হারানো বা নিখোঁজ সম্পদের বাইতুলমালঃ এতে সেইসব সম্পদ আসে যার মালিকের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না এবং সেই মালও এর অন্তর্ভুক্ত যার কোন উত্তরাধিকার নেই।

এখানে আমরা যা বলছি তা হলো ইসলামে যাকাত স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। ইহসান অথবা সেই সব ব্যক্তিগত ফরজের মধ্যে নয় যা শুধু সমাজের ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় (ইচ্ছা হলো আদায় করলো না হয় না করলো)। বরং এটা এমন এক ফরজ যার তত্ত্বাবধান, একত্রিত করণ এবং সবশেষে প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বন্টনের দায়িত্ব সরকারের। এটা এক ধরনের ইবাদাত যাতে ট্যাক্সের মত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অথবা এক ধরনের ট্যাক্স যাতে ইবাদাতের চেতনা রয়েছে। এজন্য তার হিফাজত এবং আদায়ের তত্ত্বাবধান দুই তত্ত্বাবধায়ক করে থাকে। এক, বাইরের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ মুসলমান সরকার এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ। দ্বিতীয়, আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধায়ক। যা মুসলমানের অন্তর, আল্লাহর প্রতি তার ঈমান, আল্লাহর রহমতের আকাংখা এবং খোদার শাস্তির ভীতি এই তত্ত্বাবধান করে। অবশ্য যখন এ ধরনের কোন মুসলমান সরকার না থাকে –যারা ফকিরদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং খারাপ লোকদের হাত থেকে তা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে প্রথম খলিফা সাইয়েদেনা হজরত আবু বকরের (রাঃ) মত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে ফকির সেই ইসলামী চেতনার বন্ধনে থাকবে যা খোদার কাছে রহমতের প্রত্যাশাও করে এবং তাকে ভয়ও করে। যার ঈমান তাকে এই অনুমতি দেয় না যে কোন ব্যক্তি একদম ভুরি ভোজন করে রাত কাটাবে আর তার প্রতিবেশী তারই পাশে অভুক্ত থাকবে।

যাকাতের দাবীদার বা মুসতাহিক কারা

কুরআন মজিদে যাকাত আয়ের তুলনায় তার ব্যয়ের খাতের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কেননা বিভিন্নভাবে মাল একত্রিত করা ক্ষমতাসীনদের জন্য সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতঃ কঠিন হলো তা সঠিক খাতে ব্যয় করা এবং তাদেরকে দেওয়া

যারা প্রকৃতপক্ষে তার দাবীদার। এই কারণেই কুরআন মজিদে যাকাত খরচের খাত নির্দিষ্টকরণ কোন শাসকের মত এবং ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। লোভীর লোভের কাছেও একে সমর্পণ করা হয়নি যাতে সে বাতিল পন্থায় যাকাতের হকদারদের বঞ্চিত করতে পারে। কুরআন মজিদে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে এবং কোন্ কোন্ স্থানে যাকাত ব্যয় করা যাবে সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেই সব মুনফিকদের পরিষ্কার জবাবও দেওয়া হয়েছে যাদের যাকাতের মাল দেখে মুখ থেকে লালা নির্গত হতে থাকে। তারা রাসূল (সঃ)কে বিদ্রূপ বা ভর্ৎসনা করেছিল যে তাদেরকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং তাদের আকাংখাকে পুরা করা হয়নি। আল্লাহতায়ালা ফরমিয়েছেনঃ

১) ওয়া মিনহুম মিইয়ালমিযুকা ফিস সাদাকাতি ফাইন উ'তু মিনহা ওয়া রাদু ওয়াইন লাম ইউতু মিনহা ইজা ইয়াস খতুনা (তওবা ঃ ৫৮) "হে নবী এদের কোন কোন লোক সাদকা বন্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি নানা প্রশ্ন করে আপত্তি জানায়। এই মাল সম্পদ হতে তাদেরকে কিছু দেওয়া হলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায়, আর দেওয়া না হলে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।"

২) ইন্নামাস সাদাকাতু লিলফুকারায়ি ওয়ালমাসাকিনা ওয়াল আমিলিনা আলাইহা ওয়ালমুয়াল্লাফাতি কুলুবুহুম ওয়া ফির রিকাবি ওয়াল গারিমিনা ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াবনিস সাবিলি ফারিদাতামমিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিম (তওবাঃ ৪৬) "এই সাদকাসমূহ মূলতঃ ফকির ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য যারা এতদসংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে ইহা গলদাসের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য, ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।"

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করিমের (সঃ) কাছে এলো এবং বলতে লাগলো সাদকা থেকে কিছু দিন। তিনি তাকে বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ পাক সাদকার ব্যাপারে কোন নবী অথবা অন্য কারো কোন নির্দেশ পছন্দ করেননি। বরং তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারে হাকিমসুলভ অধিকার রাখেন। বস্তুত তিনি সাদকা খরচের খাতকে আট অংশে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমিও সেই সব অংশের মধ্যে হতে তাহলে আমি তোমার সেই অধিকার দিয়ে দিতাম।" যাকাত ও সাদকার এই আট খাতের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ফকির এবং মিসকিন। এই খাত আটের মধ্যে প্রথম খাত। যাদেরকে আল্লাহ পাক যাকাতের দাবীদার নির্ধারণ করেছেন। ফকির ও মিসকিনের অর্থ এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্য নিরূপণে ও উভয়ের মধ্যে কে বেশী খারাব অবস্থার, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এই আলোচনায় ফকিহ এবং মুফাস্‌সিরদের

মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই মতপার্থক্য যাকাতের অধ্যায়ে কোন গুরুত্ব রাখে না। কেননা সব আলেমই এই ব্যাপারে একমত যে, এই দুই শ্রেণীর ফকির ও মিসকিন একই শ্রেণীর দুই ভাগ। আর তারা হল মুখাপেক্ষী শ্রেণীর। এ সত্ত্বেও ফকির সেই মুখাপেক্ষীকে বলে যারা মানুষের কাছে সওয়াল বা হাত পাতে না এবং মিসকিন মানুষের কাছে গিয়ে কিছু চায় এবং হাত পাতে। সকল ফকিহর মত হলো ফকির মিসকিনদের তুলনায় খারাব অবস্থার হয়ে থাকে। কিছু ফকিহ ফকির মিসকিনের সংজ্ঞা নির্ধারণ এইভাবে করেছেন যে, ফকির সেই ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই অথবা যদিও থাকে তাহলে তা তার এবং তার পরিবারের প্রয়োজনের অর্ধেক পূরণ করে। মিসকিন সেই ব্যক্তি যার কাছে নিজের প্রয়োজনের অর্ধেক অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী থাকে। কিন্তু এই সম্পদ তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং গোপন মুখাপেক্ষীরাই যাকাতের দাবীদার

ইসলামী শিক্ষাকে ভুল ভাবে উপস্থাপন এবং তার ভুল ব্যাখ্যার কারণেই বেশীর ভাগ লোকেরই এই ধারণা হতে পারে যে, যাকাতের দাবীদার ফকির ও মিসকিনরা যারা বেকার এবং ভিক্ষা মেঙ্গে থাকে। যারা ভিক্ষাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং প্রকাশ্যতঃ ফকির মিসকিনের বেশ ধরে রয়েছে। মসজিদের দরজায়,এবং বাজারে এবং যেসব স্থানে মানুষ একত্রিত হয়, সব যাতায়তকারীর সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ মানুষই প্রাচীনকাল থেকে মিসকিন আলোচিত ব্যক্তিদের মনে করে থাকে। এমন কি নবী করিমের (সঃ) যুগেও মানুষ ফকির মিসকিন বলতে এই সব লোককেই মনে করতো। সেই জন্য নবী করিম (সঃ) বারবার বলেছেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুখাপেক্ষী। যারা সরাসরি সমাজের সাহায্যের হকদার। যদিও বেশীর ভাগ মানুষ তাদেরকে চিনে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, সেই ব্যক্তি মিসকিন নয় যাকে এক অথবা দুটো খেজুর এবং এক অথবা দুই লোকমা দিলেই চলে যায়। বরং মিসকিন তো সেই ব্যক্তি যে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং তোমরা চাইলেও বললেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। এই গুণ সেই সব মুহাজির ফকিরদের ছিল। যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের (সঃ) জন্যই নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কাছে এতটুকু সম্পদও ছিল না এবং কোন ব্যবসাও তারা করতেন না যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে এবং অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী না থাকে। আল্লাহ তাদের এই গুণ ও অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ফরমিয়েছেনঃ বিশেষ করে সাদকার হকদার ঐ সব অভাবী মানুষ যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে নিজের ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য জমিনে কোন প্রচেষ্টাই চালাতে পারে না। তাদের আত্মসম্মান দেখে অপরিচিত লোক ধারণা করে যে তারা স্বচ্ছল। তুমি তাদের চেহারা

দেখে তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝতে পার। কিন্তু তারা এমন মানুষ নয় যে তারা মানুষের কাছে গিয়ে কিছু চাইবে।" হাদিসে নবী করিম (সঃ) যে হেদায়াত দিয়াছেন সেই হিসেবে উদ্ধৃত আয়াতে বর্ণিত এইসব লোকই সাহায্য সহযোগিতার বেশী হকদার। অন্য আর এক আয়াতে আছে, "সেই ব্যাক্তি মিসকিন নয় যে মানুষের চার পাশে ঘুরে বেড়ায় এবং এক লোকমা এবং দুই লোকমা অথবা এক ও দুই খেজুর দিলে হয়। বরং মিসকিন সেই ব্যক্তি যার নিজের প্রয়োজন পূরণের মাল নেই। চেনাও যায় না যে তাকে সাহায্য করতে হবে। আবার পথেও দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে সওয়ালও করে না। এরা সেই মিসকিন যাদেরকে মানুষ মুখাপেক্ষী করে না আবার চিনতেও পারে না। আর এরাই সাহায্য সহযোগিতার হকদার। আল্লাহর রাসূল (সঃ) মানুষের দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়েছেন। তাদের অধিকাংশেরই ঘর-বাড়ী আছে , মানইজ্জত সম্পন্ন পরিবারের সাথে সম্পর্ক আছে। কিন্তু দারিদ্র তাদের ঘিরে রেখেছে। অথবা তাদের সম্পদের স্বল্পতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হয়ে গেছে। অথবা কাজ-কাম ও পরিশ্রম করে এত আয় হয় না যে তা দিয়ে তাদের বৈধ প্রয়োজন মিটাতে পারে। ইমাম হাসান বছরিকে (রঃ) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যার বাড়ী আছে এবং একজন খাদেমও আছে-সে কি যাকাত গ্রহণ করতে পারে ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, যদি হাজতমন্দ হয় তাহলে সে গ্রহণ করতে পারবে। তাতে দোষের কিছুই নেই। ঈমাম আহম্মদ বিন হাম্বলকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যার কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে। তা থেকে কিছু আয় হয়। অথবা হাজার দিরহাম কিংবা তা থেকে কম বেশী মূল্যের সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু তার আয়ে তার প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাহলে সে কি যাকাত নিতে পারবে ? তিনি বলেছেন, সে যাকাতের কিছু অংশ নিতে পারবে। শাফয়ী মতাবলম্বীদের মত হলো, যদি কারোর কাছে স্থাবর সম্পত্তি থাকে কিন্তু তার আয় তার প্রয়োজন পূরণে কম হয় তাহলে সে ফকির-মিসকিনদের দলে পড়বে এবং তাকে যাকাত থেকে এত পরিমাণ মাল দেওয়া যাবে যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয় এবং তার সম্পত্তিও বিক্রয় করতে না হয়। ঈমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির কাছে যাকাতের নিছাব পরিমাণ অথবা তা থেকে বেশী সম্পদ থাকে এবং বাড়ী ও খাদেমও থাকে তাহলে অধিক সন্তান-সন্ততির কারণে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েজ। হানাফীরা এই মতের অনুসারী যে, যদি এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হয় যার থাকার যায়গা রয়েছে, ঘরে প্রয়োজনীয় সব জিনিষ, খাদেম, ঘোড়া, অস্ত্র শস্ত্র, শরীরের কাপড় প্রভৃতিও রয়েছে। যদি সে জ্ঞানী হয় তাহলে বই-পুস্তকও আছে। তবুও তাকে যাকাত দানে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা নাই। তারা হাসান বছরির (রঃ) সেই বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন যাতে তিনি বলেছেন, "যিনি ঘোড়া, হাতিয়ার, খাদেম এবং বাড়ীর মূল্যে দশ হাজার দিরহামের মালিক হতেন ছাহাবা

কেরামরা (রঃ) তাকেও যাকাত দিতেন।" কেননা এসব জিনিষ মানুষের সেই অত্যাবশ্যকীয় বস্তু যা ছাড়া উপায় নেই। এজন্য যাকাতের হকদারীর প্রশ্নে এইসব বস্তু হওয়া না হওয়া সমান। জানা গেল যে,যাকাত শুধু সেই বঞ্চিত এবং মুখাপেক্ষীর জন্যই নয় যার কাছে কিছু নেই অথবা সে কোন কিছুরই মালিক নয় বরং সেই ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া যায় যার কাছে এতটুকু পরিমাণ মাল আছে যা দিয়ে কোন ভাবে তার প্রয়োজন মিটে।

উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য যাকাতের কোন অংশ নেই

প্রয়োজনই যখন যাকাত ও ছাদকার হওয়া–ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে তখন যদি কোন বেকার মানুষ সমাজের উপর বোঝা হয়ে ছাদকা ইত্যদির মাধ্যমে জীবন যাপন করে, প্রকৃতপক্ষে সে সুস্থ, সবল এবং শক্তিশালী। আয় করার ক্ষমতা রাখে এবং কোন কাজ এবং ব্যবসা করে নিজেকে অন্যদের হাত থেকে মুখাপেক্ষীহীন করতে পারে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে? কিছু লোকের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, যাকাত বেকারকে উৎসাহ যোগায় এবং উপার্জনশীলকে হাঁটুর উপর হাটু রেখে বসে থাকার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইসলামের নীতি অন্য সিদ্ধান্তের কথা বলে। উপার্জনশীল প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরজ হলে সে কাজ করবে। নিজের কাজের উন্নতির জন্য সে পা চালাবে এবং নিজের হাতের শ্রম ও কপালের ঘাম দিয়ে রুজী কামাই করে নিজের প্রয়োজনাবলী পূরণ করবে। ছহিহ হাদিসে বলা হয়েছে, "কোন ব্যত্তি নিজের হাতে কামাই করে খাওয়া থেকে ভালো কোন খাবার পেতে পারে না" একারণেই পয়গম্বররা (সঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ছাদকা প্রভৃতি কোন মালদার, সামর্থ্যবান, ও সুস্থদেহ সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জায়েজ নয়"। শারিরীক সামর্থ এবং শারিরীক শক্তি অর্থহীন হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা দিয়ে কাজ করে রিজিক ও রুজী কামাই না করা হবে। কেননা কাম ছাড়া শক্তি উলঙ্গকে কাপড় পরাতে পারে না এবং অভুক্তকে খাবার খাওয়াতে পারে না। অবশ্যই ইমম নববী (রঃ) বলেছেন, "যদি কোন মেহনত মজদুরকারী কাজ না পায় তাহলে তার জন্য যাকাত জায়েজ। কেননা সে অসহায়।"

ওপরে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে শুধু শক্তিশালী এবং সুঠামদেহী শব্দসমূহের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্য এক হাদীসে শক্তির সাথে কামাই করাকে (মেহনত মজদুরী করা) যোগ করা হয়েছে। বস্তুতঃ উবাইদুল্লাহ বিন আদি বিন খিয়ার থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি তাকে বলেছে, তারা ছাদকা প্রভৃতি চাওয়ার জন্য নবী আকরামের (সঃ) খিদমতে হাজির হলে তিনি দেখলেন যে তারা উভয়ই সুস্থ ও শক্তিশালী। তিনি বললেন, "তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের যাকাত দিয়ে

দিই। কিন্তু স্মরণ রেখো সম্পদশালী, শক্তি ও সামর্থবান এবং যারা মেহনত মজদুরী করতে পারে তাদের জন্য যাকাতের কোন অংশ নেই "। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ব্যাপারে 'তুমি' 'তোমরা চাও' শব্দসমূহ এজন্য ব্যবহার করেছেন যে তিনি তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হতে পারে যে তারা প্রকাশ্যতঃ দেখতে সুঠাম দেহী ও শক্তিশালী ছিল কিন্তু বাস্তবত তারা কোন কাজ পায়নি অথবা যদি পেয়েও থাকে তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক আয় হয়নি। এই হাদিস থেকে আলেমরা দলিল দিয়েছেন যে, সমসাময়িক শাসক অথবা সম্পদের মালিকের উচিত তারা যেন যাকাত গ্রহণকারীকে ওয়াজ নসিহত করেন। যাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নন এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) আদর্শের উপর আমল করে তাদেরকে বলতে হবে যে, সম্পদশালী এবং মজদুরী করতে পারে তাদের জন্য যাকাত জায়েজ নয়। এখানে মেহনত–মজদুরীর মর্ম কথা হলো, পরিশ্রম ও মজদুরী করে প্রয়োজন মত আয় করা। যদি কোন ব্যক্তি পরিশ্রম ও মজদুরী সত্ত্বেও প্রয়োজনমত আয় করতে না পারে তাহলে সে যাকাত পাওয়ার অধিকারী। শুধুমাত্র কোন কাজ এবং কামাইয়ে অযোগ্য বা দুর্বল হওয়াই যাকাতের হকদার হওয়া প্রশ্নে কোন শর্ত নয়। যাকাত শুধু-মাত্র পঙ্গু, রোগী এবং যারা কাজের শক্তি রাখে না তাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন, কাজের যোগ্য হওয়ার প্রশ্নে দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে এও যে, কাজটি তার উপযুক্ত কিনা। তা না হলে যে কাজ তার উপযুক্ত নয় তা যদি সে পায়ও তাহলে তা না পাওয়ারই নামান্তর। যেমন ভাল শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, তুমি কুলিগিরির কাম তো করতে পার। এজন্য তুমি বেকার নও এবং যাকাতে তোমার কোন অধিকার নেই। শক্তি–সামর্থবান এবং সুঠাম–দেহীর ওপর যাকাত হারাম হওয়ার যে হাদিস উপরে বর্ণিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সেই শক্তি সামর্থবানের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে উপযুক্ত কাজ মেলার পরও বেকারত্বকে বৃত্তি হিসেবে মনে করে।

সার কথা

যে কামাই করে খাওয়ার শক্তি রাখে সে কাজ করুক শরীয়ত এটাই তার কাছে চায়। যাতে সে স্বাবলম্বী হতে পারে। আর যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা যেমন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, মহিলা হওয়া, দুর্বলবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, বৃদ্ধ হওয়া, মুছিবতজাদা হওয়া, এবং কোন অসুখের কারণে কাজ করতে অক্ষম, অথবা কাজ করতে পারলেও উপযুক্ত কাজের হালাল মাধ্যম না পাওয়ায় অথবা যদি না পায়ও তাতে আয় এত কম হয় যে তার এবং পরিবার–পরিজনের ভরণ পোষণ করতে পারেনা অথবা কিছু চাহিদা মেটাতে পারে কিন্তু পুরো প্রয়োজন মেটাতে পারে না, তার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। আল্লাহর

দ্বীনে এমন লোকের যাকাত গ্রহণে কোন গুনাহ নেই। এটাই ইসলামের আলোকোজ্জ্বল শিক্ষা যাতে ন্যায় ও ইহসান অথবা ন্যায় ও রহমত উভয়ই বিদ্যমান। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার ধারক বাহকদের এই নীতি, "যে কাজ করতে পারে না সে খাবেও না।" এই নীতি অস্বাভাবিক, নৈতিকতা বিবর্জিত এবং মানবতা বিরোধী। এই সব বস্তুবাদীর চেয়েও জীবজন্তু ভাল। যাদের কিছু শক্তিশালী দুর্বলদেরকে বহন করে এবং শক্তিশালী দুর্বল ও বঞ্চিতদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। মানুষ কি এইসব চতুষ্পদদের মর্যাদায়ও পৌছতে পারে না ?

সার্বক্ষণিক ইবাদতকারী যাকাত নেবে না

ইসলামের ফকিহরা বাস্তবিকই কত উত্তম কথা বলেছেন যে, উপার্জনে ক্ষমতাশালী লোক হালাল উপার্জনের প্রচেষ্টা ছেড়ে নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে যেমন রোযা, নামাজ প্রভৃতিতে ওয়াকফ করে দেয় তাহলেও যাকাত দেওয়া হবে না। কেননা তাকে তো কাজ করার এবং জীবিকা সংগ্রহে জমিনের এদিক-সেদিক চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামে দুনিয়া ত্যাগে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ইবাদত এজন্য নয় যে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে মানুষ শুধু ইবাদতই করবে। আয়ের জন্য কাজ করা নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। শর্ত হলো নিয়ত ভালো এবং আল্লাহর সীমার অনুগত হতে হবে।

সার্বক্ষণিক ছাত্র যাকাত নেবে

যখন কোন ব্যক্তি লাভজনক জ্ঞান অর্জনে নিজেকে ওয়াকফ করে দেয় এবং হালাল উপার্জন এবং জ্ঞান অর্জন একসাথে কঠিন হয় তাহলে যাকাতের মাল থেকে এতটুকু পরিমাণ দেওয়া যাবে যা তার শিক্ষাগত প্রয়োজন পূর্ণ করতে সাহায্য করে এবং যাতে তার ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত প্রয়োজন পূরণ হয়। ছাত্রকে এজন্য যাকাত দেওয়া উচিত যে, সে জাতির তরফ থেকে ফরজে কেফায়া আদায় করে থাকে এবং শিক্ষা লাভ শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনেই সীমিত থাকে না বরং সমগ্র মুসলিম জাতিই তা থেকে লাভবান হয়। এ জন্য এ ধরনের ব্যক্তির অধিকার হলো যাকাতের মাল থেকে তাকে সাহায্য করতে হবে। কেননা যাকাত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের জন্য হয়ে থাকে। হয় সেই ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের মধ্যে মুখাপেক্ষী ও অভাবী হবেন। অথবা সেই ব্যক্তির জন্য যার খিদমত মুসলমানদের প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্রের মধ্যে এই দুই বস্তুই পাওয়া যায়। ছাত্র জাকাতের হকদার হওয়ার প্রশ্নে কতিপয় ফকিহ শর্ত আরোপ করেছেন। শর্ত হলো-- ছাত্রটিকে প্রতিভাধর এবং তার থেকে এই আশা করা যায় যে, সে জ্ঞান অর্জন করবে ও তার থেকে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে।

এছাড়া প্রয়োজন মোতাবেক জ্ঞান অর্জনের পর যখন সে কামাই করে খাওয়ার যোগ্য হবে তখন যাকাত গ্রহণের হকদার হবে না। আর এটা সঠিক কথাও, উচ্চ শিক্ষার জন্য যাকাত সেই সময় খরচ করা যাবে যখন ছাত্র তার যোগ্য হবে। বরং যদি ছাত্র ভাল দার্শনিক হতে পারে তাহলে তার শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যও যাকাত খরচ করা যাবে।

ফকির—মিসকিনকে কতটুকু পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে

এখানে আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দানেরও প্রয়োজন রয়েছে। যাতে আমাদের সামনে ইসলামী যাকাতের সঠিক এবং পূর্ণ চিত্র এসে পড়ে এবং জানাও হয় যে, দারিদ্র্য ও অভাব মোকাবিলায় যাকাত কি ধরনের প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। এই প্রশ্নের জবাব দানের গুরত্বের কারণ হলো মানবজাতি তা মুসলমানই হোক বা অমুসলমানই হোক এই ভুলে নিক্ষিপ্ত রয়েছে যে, ফকির বা অভাবগ্রস্ত কয়েক দিরহাম, কয়েক টাকা, কয়েক সের তরিতরকারি, কয়েকটি রুটি গ্রহণ করে নিজের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে। অথবা তা দিয়ে কয়েকদিন, এক মাস বা দুই মাস নিজের প্রয়োজন মেটায়। এরপর সে আবার ক্ষুধা পীড়িত এবং হাত পাতার অবস্থায় ফিরে যায় এবং স্থায়ীভাবে সাহায্যের জন্য হাত পাততে থাকে। এমনিভাবে যাকাত সেই আরামদায়ক ট্যাবলেট—সদৃশ হয় যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগীকে আরাম দেয়। এটা এমন ওষুধের তুল্য নয় যা দুঃখ—কষ্ট ও রোগের শিকড় সম্পূর্ণ রূপে উপড়ে ফেলতে পারে। এই প্রসঙ্গে ফকিহদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে ইসলামী আহকাম ও দলিল সমূহের নিকটতম মত হলো অভাবগ্রস্তকে এতটুকু পরিমাণ দিতে হবে যা তার দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার কারণ সমূহের শিকড় উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয় এবং সে দ্বিতীয়বার আর যাকাতের মুখাপেক্ষী না হয়। ইমাম নববী (রঃ) 'আলমজমু' গ্রন্থে বলেছেনঃ ফকির মিসকিনকে যাকাতের মাল কতটুকুন দিতে হবে? আমাদের ইরাকী ও অধিকাংশ খোরাসানী আসহাব বলে থাকেন, "উভয়কে এত মাল দিতে হবে যা তাদের প্রয়োজন ও অভাবগ্রস্ততা থেকে বের করে ধনী ও প্রয়োজন না থাকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। মোদ্দা কথা হলো তাদেরকে এত সম্পদ দিতে হবে যা চিরকালের জন্য তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়।" এটা ইমাম শাফেয়ীর কথা। তিনি এ বক্তব্যের সমর্থনে কাবিছা বিন মাখারিক হিলালীর (রঃ) হাদিস পেশ করেছেন। হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেন, "সওয়াল করা (প্রয়োজনে সম্পদ ইত্যাদি ভিক্ষা করা) শুধু তিন ব্যক্তির জন্য জায়েজ। এক ঋণগ্রস্ত, তার জন্য সওয়াল করা জায়েজ। এমনকি সে এত মাল লাভ করবে যে তার জীবনের প্রয়োজনাবলী পূরণ হয়ে যাবে। অথবা এমন শক্তি সে অর্জন করবে যা তাকে নিঃস্ব করতে সক্ষম না হয়। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাকে

হঠাৎ করে আপতিত মুসিবত ঘিরে ধরেছে এবং সে এত মাল পেতে পারে যা দিয়ে তার সকল প্রয়োজন পূরণ সম্ভব হয়। তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে বুভূক্ষার সম্মুখীন। তার জাতির তিন জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রকৃত পক্ষেই সে বুভূক্ষার সম্মুখীন। তাইলে তার জন্য সওয়াল করা জায়েজ। সে এত পরিমাণ মাল পেতে পারে যা দিয়ে তার জীবনের প্রয়োজন পূরণ হয় অথবা তিনি বলেছেন, সে এমন শক্তি অর্জন করবে যা তাকে নিঃস্ব করতে সক্ষম না হয়। এছাড়া কোন ধরনের সওয়াল করা কাবিছা হারাম। যে এ ধরনের সওয়াল করে বা ভিক্ষা করে খায় সে হারাম খায়। (সহিহ মুসলিম)।

আমাদের আসহাবরা বলেছেন যে, রাসুলে করিম (সঃ) প্রয়োজন পূরণের সীমা পর্যন্ত সওয়াল করার অনুমতি দিয়েছেন। এটা আমাদের বক্তব্যের একটা দলিল। আসহাবরা বলেছেন, সওয়ালকারী যদি সাধারণতঃ কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে এত পরিমাণ দিতে হবে যা দিয়ে সে নিজের শিল্প চালাতে পারে অথবা শিল্পের সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারে। তার মূল্য বেশী হোক অথবা কম। কুটির শিল্পের সরঞ্জামের জন্য প্রদত্ত অর্থ এই পরিমাণ হতে হবে যার লাভ দিয়ে সওয়ালকারীর জীবনের প্রয়োজন প্রায় পূরণ হয়। এই অর্থের পরিমাণ কুটির শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তির প্রকার, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কম বেশী হতে পারে। এ সত্ত্বেও আমাদের আসহাবরা নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সবজী বিক্রেতা সওয়ালকারীকে পাঁচ অথবা দশ দিরহাম দিতে হবে। এবং সওয়ালকারী যদি মনি মুক্তা ব্যবসায়ী হয়, তাহলে তাহাকে দশ হাজার দিরহাম দিতে হবে। কেননা এর কম অর্থ বিনিয়োগে তার প্রয়োজন মাফিক তার লাভ হতে পারে না। ব্যবসায়ী রুটিওয়ালা, আতর বিক্রেতা অথবা মহাজনের স্ব স্ব পেশার অনুপাতে অর্থ দিতে হবে। দরজী, ছুতার, কসাই, ধোপা অথবা এছাড়া অন্যান্য যে সব কারিগর রয়েছে তাদেরকে এত পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যা দিয়ে তারা কাজের সরঞ্জাম খরিদ করতে পারে। সওয়ালকারী যদি কৃষিজীবি হয় তাহলে যাকাতের সম্পদ থেকে এত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা দিয়ে সে কোন আবাদযোগ্য পরিমাণ জমি কিনে কৃষি কাজ করতে পারে এবং যার উৎপাদন দিয়ে সব সময়ের জন্য জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু সাওয়ালকারী যদি কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় এবং কোন কাজও ভাল ভাবে না করতে পারে, ব্যবসা সম্পর্কে তার কোন কিছু জানা এবং কোন জীবিকা সম্পর্কেই কিছু না জানে তাহলে তাকে বাৎসরিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট বয়সের জন্য যথেষ্ট সম্পদ দিতে হবে। যে বয়সে সাধারণতঃ সওয়ালকারীর এলাকায় তার মত লোক পেয়ে থাকে। যেমন তাকে এত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা দিয়ে কোন সম্পত্তি (ঘর, দোকান অথবা প্রভৃতি) কিনে ভাড়া দেবে এবং ভাড়ার অর্থে সে নিজের জীবনের প্রয়োজন মেটাতে থাকবে।

এত গেল ইমাম শাফেয়ী ও তার আসহাবদের মত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে যে, ফকির ব্যবসা সরঞ্জাম অথবা শিল্প সামান ইত্যাদির সুরতে সবসময়ে নিজের জীবন ধারণের জন্য সব কিছু নিতে পারে। হাম্বলী মাজহাবের কতিপয় আলেম এই রাওয়াতকে গ্রহণ করেছেন। এসব কথা আমরা নিজেরাই বলছি না বরং আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং ফুকায়ে ইসলামের আহ্কাম ও কায়দা কানুনের স্পষ্ট দলিল থেকে প্রমাণ দিয়ে বলছি। এসব কথায় দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে চিরতরে খতম ও যাকাত দিয়ে ফকিরকে ধনী বানানোর ইসলামের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করে। ফকির মিসকিনকে দেওয়ার ব্যাপারে হযরত ওমরের (রাঃ) নীতি অত্যন্ত হিকমত পূর্ণ ছিল। "যখন তোমরা ফকির মিসকিনকে কিছু দেবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।" বস্তুতঃ যখন তার কাছে কোন যথাযথ ফকির অথবা মিসকিন আসত তখন তিনি যাকাত দিয়ে তাকে সম্পদশালী করে দিতেন। শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য কয়েক লোকমা অথবা কিছু সহায়তা দানের জন্য কয়েক দিরহাম যথেষ্ট মনে করতেন না। একবার এক ব্যক্তি নিজের দুরবস্থার অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলো। তিনি তাকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষার জন্য তিনটি উট দিলেন। সে সময় উট সবচেয়ে বেশী লাভজনক ও উত্তম সম্পদ হিসেবে গণ্য হত। তিনি ছাদকা প্রভৃতি বন্টনকারী অফিসারদেরকে বলে রেখেছেন যে, "হকদার ফকির ও মিসকিনদেরকে বার বার ছাদকা দেবে। যদিও তাদের কাছে একশ' উট থাকে।" ফকিরদের প্রসঙ্গে নিজের নীতি ঘোষণা করে তিনি বলেছিলেন, "আমি মুসতাহিক ফকির ও মিসকিনকে বার বার ছাদকা দিব। এভাবে তাদের কাছে যদি একশ' উটও চলে যায়।" প্রখ্যাত ফকিহ এবং জলিলুল কদর তাবেয়ী আতা বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানের কোন একই মুসতাহিক পরিবারের এক ব্যক্তিকে নিজের সম্পদের যাকাত দিয়ে তার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে এই কাজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় হবে।" হযরত ইমাম আবু ওবায়দুল কাসেম বিন ছালাম নিজের গ্রন্থ "আল-আমওয়ালে" হজরত আতার উল্লিখিত বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মালিক, হাম্বলী এবং অন্যান্য কতিপয় ফকিহর মত হলো, ফকির ও মিসকিনকে এত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যা দিয়ে তার ও তার পরিবার-পরিজনের এক বছর পর্যন্ত গুজরান চলে। তাদের মতে এই পরিমাণ যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই যা সমগ্র জীবনের জন্য যথেষ্ট। এভাবে তারা এও বলে থাকেন যে, এক বছর চলার চেয়েও কম পরিমাণ দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা দিন গুজরানোর এক বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেননা সাধারণতঃ মধ্যম পন্থা হিসেবে অর্থ অথবা খাদ্য এক বছরের জন্য জমা করা হয়। বস্তুতঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য এক বছরের খাবার জমা করেছিলেন। যাকাত যেহেতু প্রতি

বছর আদায় করা হয় সেহেতু সারা জীবন গুজরানোর জন্য অর্থ প্রদানের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক বছর যাকাতের নতুন সম্পদ আদায় হয়। যে ব্যক্তি আগের বছর যাকাতের হকদার ছিল এবং যদি সে পরের বছরও হকদার তাহলে তাকে এই বছরের জাকাত দেওয়া যেতে পারে। এই মতের প্রবক্তারা এক বছর চলার জন্য কত পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে তা নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং যাকাতের হকদারকে এক বছরের খরচ দেওয়া হবে তা যত পরিমাণেই হোক।

যাকাতের আরও কতিপয় হকদার

ওলামায়ে ইসলাম যদি তাদের চিন্তা-ভাবনা একটু নিবিষ্ট করতো তাহলে আমাদের নিকট তা অবশ্যই প্রশংসনীয় ব্যাপার হতো। ব্যাপারটি হলো, খানা পিনা, পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানই শুধু মানবীয় প্রয়োজন নয়। বরং মানুষের মধ্যে আরও আবেগ এবং অনুভূতি পাওয়া যায়। যা বারংবার পূরণের তাগিদ দেয়। আর এই আবেগ পূরণ হলেই তার মধ্যে প্রশান্তি আসে। এইসব আবেগের কারণেই ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি প্রকৃতি ও স্বভাবগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এই আকর্ষণ আল্লাহরই সৃষ্টি। এই আকর্ষণ মানব বংশের স্থায়িত্বের প্রশ্নে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে তাকে জমিনে বংশ বিস্তারে বাধ্য করে। ইসলাম এই প্রকৃতি ও স্বভাবগত আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে নয়। বরং ইসলাম শরয়ী সীমার অধীন এই আকর্ষণ ও ইচ্ছা পূরণের জন্য বিয়ে-শাদীর নির্দেশ দেয়। ইসলাম কুমারত্বের জীবন এবং খাসিকরণ ও স্বভাবগত ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে দাবিয়ে দেওয়াকে নিষেধ করেছে। যে ব্যক্তি পারিবারিক জীবনের দায়িত্বসমূহ পালন করতে সক্ষম তাকে বিয়ের তাকিদ দিয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ আছে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিবাহ মানুষের চোখ ও নফসের খাহেশকে হেফাজত করে।" বস্তুত ইসলামে তাদের সাহায্য করা আবশ্যক যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক। কিন্তু ভরণ-পোষণে যদি সে অক্ষম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করাটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এই প্রশ্নে যদি আলেম সম্প্রদায় যাকাতের মাল খরচের নির্দেশ দেন তাতেও আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মত কিছুই নেই। আবু উবায়েদ 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজের পুত্র আছিকে বিয়ে দিলেন এবং তাকে এক মাস পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে খরচ প্রদান অব্যাহত রাখেন। খলিফায়ে রাশেদ ওমর বিন আব্দুল আজিজ এক ব্যক্তিকে একটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। নির্দেশটি হলো সেই ব্যক্তি প্রত্যেকদিন তার পক্ষ থেকে ডেকে ডেকে বলতেন, কোথায় মিসকিন? কোথায় আছে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, কোথায় আছে সেই সব ব্যক্তি যারা বিয়ে করতে চায় ? আর কোথায় সেই সব

এতিম? আমি তাদের সবাইকে ধনী বানিয়ে দিতে চাই। এই প্রসঙ্গে মৌখিক কথা আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, "নবীর (সঃ) নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করে ফেলেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত মহরানায় তুমি তকে বিয়ে করেছ ? সে বললেন চার আওকিয়ার বিনিময়ে। নবী (সঃ) ফরমালেন, চার আওকিয়ায়? তুমি তো মনে হয় ঐ পাহাড়ের গা থেকে রৌপ্য কেটে আনবে। আমার নিকট কিছুই নেই যা তোমাকে দিতে পারি। বরং হাঁ এটা হতে পারে যে আমি তোমাকে কোন অভিযানে প্রেরণ করবো সেই অভিযানে তুমি কিছু নিয়ে নিবে।" এই হাদিস এক কথার প্রমাণ দেয় যে, বিয়ের জন্য কিছু দেওয়া সে যুগেও প্রসিদ্ধ ছিল। এ জন্য নবী (সঃ) সেই ব্যক্তিকে এ কথা বলেননি যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য কোন সাহায্য সহযোগিতার হকদার নও। বরং তিনি বলেছিলেন যে, আমার নিকট কিছু নেই যা তোমাকে দিতে পারি এবং সেই সাথে তাকে দ্বিতীয় মাধ্যম বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এমনিভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞানমূলক পুস্তকাদিও প্রয়োজনীয় বস্তু। বরং সাধারণ মানুষও যদি জ্ঞান হাসিল করতে চায় তাকেও যাকাতের খাত থেকে পুস্তকাদি সরবরাহ করা উচিত। ইসলাম এমন এক দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, জ্ঞান অর্জনের দাওয়াত দেয়। আলেম ও শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত মর্যাদা দান করে। জ্ঞানকে ঈমানের চাবি এবং আমলের পথ প্রদর্শক বলে থাকে। জ্ঞানবিহীন ঈমান ও ইবাদতকে কোন গুরুত্বই দেয় না। কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "হাল ইয়াসতাবিল লাজিনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাজিনা লা ইয়ালামুন" (জ্ঞানী ও মুর্খ কি কখনো সমান হতে পারে?) মুর্খ ও জ্ঞানী এবং মুর্খতা ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের ভেদ রেখা টেনে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, "ওয়ামা ইয়াসতাবিল আ'মা ওয়ালবাসির ওয়ালাজজুলুমাতু ওলাননুর" (চক্ষুষ্মান ও অন্ধ সমান হতে পারে না এবং অন্ধকার ও আলো বরাবর হতে পারে না)। নবী করিমের (সঃ) ইরশাদ হলো : জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এখানে জ্ঞান অর্থ শুধু দ্বীনের জ্ঞানই নয় বরং সেই উপকারী জ্ঞানও যা মুসলমাদের পার্থিব ব্যাপারে প্রয়োজন হয়। কেননা ইমাম গাজ্জালী এবং শাতেবী প্রমুখ এ ধরনের উপকারী জ্ঞান আহরণকে ফরজে কিফায়া বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেকে অন্য কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তাহলে ইসলামের ফকিহরা আহকামে যাকাত প্রসঙ্গে তাকে যদি যাকাত দানের নির্দেশ দেয় তাহলে তা আশ্চর্যের কোন ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। সেই যাকাত থেকে সে পুস্তকাদি ক্রয় এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। বরং কোন ব্যক্তি যদি ইবাদতের জন্য শুধু শুধু বসে থাকে তাকে যাকাত দেওয়া যায় না। কেননা ইসলামে ইবাদতের জন্য এত অবসরের প্রয়োজন নেই যা জ্ঞান অর্জন ও তাতে পূর্ণতা

লাভের জন্য প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত ইবাদতের ফায়দা শুধু মাত্র ইবাদতকারীর হবে। পক্ষান্তরে ছাত্রের জ্ঞানের উপকার একদিকে যেমন তার নিজের তেমনি অন্যান্য মানুষেরও। ইসলাম শুধু একেই যথেষ্ট বলেনি বরং ফকিহরা বলেছেন, মুখাপেক্ষী যাকাতের মাল থেকে জ্ঞানের বই–পুস্তকও কিনবে। কেননা এইসব বইতে দ্বীন দুনিয়ার মঙ্গল রয়েছে। আর এই মঙ্গল তার জন্য প্রয়োজন।

কোনমাজহাব অনুসরণ যোগ্য ?

যাকাত বন্টন প্রসঙ্গে ইসলামী ফিকাহর মধ্য থেকে এই দুই মাজহাব পেশ করার পর প্রশ্ন ওঠে দুই মাজহাবের মধ্যে কোনটি অনুসরণ যোগ্য? মুখাপেক্ষী ফকিরকে সারা জীবনের প্রয়োজন একেবারে মিটিয়ে দেওয়ার মাজহাব অথবা বছরের প্রয়োজন প্রতি বছর পূরণের মাজহাব? প্রকৃতপক্ষে দুই মাজহাবের প্রত্যক মাজহাবেই সঠিক হওয়ার দলিল রয়েছে। বিশেষ করে যাকাতের সম্পদ জমা ও বন্টনের দায়িত্ব যখনই ইসলামী রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করবে তখন দুই মাজহাবের উপরই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমল করা সম্ভব। কেননা উভয়ের কার্যসীমা পৃথক হতে পারে। পরমুখাপেক্ষী বা অভাবী ও মিসকিন দু'ধরনের হয়। প্রথম ধরনে সেই সব অভাবী হয়ে থাকে যারা কাজ করে নিজের রুজি কামাই করতে পারে এবং নিজেই নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। যেমন কারিগর, দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি। কিন্তু তাদের নিকট কাজের হাতিয়ার, ব্যবসার জন্য মূলধন অথবা জমি ও কৃষি এবং সেচের যন্ত্রপাতি নেই। এই সব অভাবীদের জন্য প্রয়োজন হলে তাদেরকে যাকাত থেকে এমন পরিমাণ দিয়ে দেওয়া যা দিয়ে তারা সারা জীবনের রুজি কামাই করতে পারে। নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং দ্বিতীয় বার যাকাতের মুখাপেক্ষী না হয়। বর্তমান যুগে এই প্রস্তাব কার্যকর করা যায়। যাকাতের মাল থেকে কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানিয়ে সেই সব সক্ষম অভাবীদের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে। আরেক ধরনের হলো যারা কাজ এবং রুজী কামাইয়ে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। উদাহরণস্বরূপ বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পা কাটা, বিধবা, শিশু প্রভৃতি। এইসব মুখাপেক্ষীকে সারা বছরের জীবনের প্রয়োজন পূরনের জন্য প্রত্যেক বছরই যাকাত দেওয়া যেতে পারে। বরং যদি ভয় থাকে যে একবারে অর্থ নিয়ে তারা অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করে ফেলবে অথবা অপচয় করবে তাহলে তাদেরকে মাসিক প্রয়োজন হিসেবে প্রত্যেক মাসেই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানই সঠিক। আধুনিক যুগে এই প্রস্তাব ঠিক তেমনিভাবে বাস্তবায়ন করা চাই যেমন চাকুরীজীবিদেরকে মাহিনা দেওয়া হয়। সুন্দর ব্যাপার হলো দেখুন, যখন আমি যাকাত বন্টনের এই পদ্ধতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করে ফেলেছি তখন হাম্বলী মাজহাবের কতিপয় কিতাবে এই পদ্ধতিই লিপিবদ্ধ পাই। বস্তুত

গায়াতুল মুনতাহা এবং তার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রঃ) কথা, "যদি কোন ব্যক্তির নিকট এতটুকু পরিমাণ সম্পদ অথবা জমি থাকে যা দিয়ে সে দশ হাজার টাকা অথবা তা থেকে বেশী কামাই করতে পারে এবং এই অর্থ তার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজন পূরণে যাকাত গ্রহণ জায়েজ" উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, এই ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে কোন পেশাজীবিকে তার পেশার হাতিয়ারের মূল্য দিতে হবে। তার মূল্য যত বেশীই হোক না কেন। ব্যবসায়ীকে প্রয়োজন মাফিক মূলধন দিতে হবে। এ ছাড়া ফকির মিসকিনকে এত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে যা তার এবং তার পরিবার–পরিজনের এক বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়। কেননা আগামী বছর পুনরায় সে প্রয়োজন মাফিক যাকাত পাবে।

বোধগম্য জীবন যাত্রার মান

এ থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে ইসলামে যাকাতের উদ্দেশ্য অভাবী এবং ফকিরকে কয়েকটি টাকাই প্রদান নয় বরং তার লক্ষ্য হলো সেই যুক্তিসিদ্ধ ও বোধগম্য জীবন যাত্রার মান প্রতিষ্ঠা করা যা মানুষের ধারক হতে পারে। আল্লাহপাক যাকে ইনসানিয়াৎ এবং জমিনে খেলাফতের মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন এবং তা সেই মুসলমানের অবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল হয় যা ইনসাফের দ্বীন ও ইহসানের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই দ্বীন তো শ্রেষ্ঠ উম্মতের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহপাক তো এই উম্মতকে সমগ্র মানবতার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম 'আলমুহাল্লা' তে এবং ইমাম নববী 'আল মাজমু'তে ও অন্যান্য আলেম এবং ফকিহরা বলেছেন , মানবীয় জীবনের মান নিদেন পক্ষে কায়েম করতে হলেও মানুষের খানা–পিনার মত প্রয়োজন, শীত ও গ্রীষ্মে পরিধানের জন্য পৃথক পৃথক কাপড় এবং বাসের জন্য তার উপযোগী বাসস্থান পেতে হবে। ইমাম নবৃবী (রঃ) ন্যূনতম চাহিদার সংজ্ঞা এই ভাবে নিরুপণ করেছেন, যা ছাড়া মানুষ ফকির হয়ে যায় (মিসকিন নয়, কেননা মিসকিন ইমাম নবৃবীর নিকট ফকিরের তুলনায় স্বচ্ছল হয়।) বস্তুত যখন বলা হয় যে, কোন ব্যক্তির নিকট জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ন্যূনতম বস্তু রয়েছে তার অর্থ হবে, তার নিকট খানা–পিনার, সামান পরিধানের কাপড়, অবস্থানের জন্য বাসস্থান এবং জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য উপযোগী বস্তু রয়েছে। আর এসব সে অপচয় অথবা বখিলীর মাধ্যমে অর্জন করেনি"। বর্তমান যুগে সন্তানকে দ্বীনের হুকুম আহকাম সম্বলিত শিক্ষা প্রদানও মানুষের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ে। শুধু তাই নয় সমকালীন জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। যাতে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে বা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। ফকিহরা মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদার

কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মুসলমানের প্রথম প্রয়োজন তো হলো তাকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞান ও আলোর জগতে নিয়ে আসা। কেননা অজ্ঞতা মৃত্যুর শামিল।

দ্বিতীয় আবশ্যিক প্রয়োজন হলো, যদি কোন ব্যক্তি বা তার পরিবার পরিজনের কেউ অসুস্থ থাকে তাহলে তার চিকিৎসার সুযোগ–সুবিধা থাকতে হবে। তাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যাবে না যে সে অসুস্থ থেকে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এ তো হত্যাকান্ড এবং আত্মহত্যায় নিক্ষেপ করা। হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে, হে আল্লাহর বান্দাহ ! অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। কেননা যে আল্লাহ রোগ ও অসুস্থতা সৃষ্টি করেছেন তিনিই ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর ফরমান হলোঃ "ওয়ালা তাক্‌তুলু বি আইদিকুম ইলাত্‌ তাহলুকাতি" (নিজে নিজেকে হালাকাতের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা))। এবং "ওয়ালাতাকতুলু আনফুছাকুম ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা"। (নিজে নিজেকে কতল করোনা, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সাথে অনেক রহম করে থাকেন))। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, "আলমুসলিমু আখুল মুসলিমু লা ইয়াজলুমুহ ওয়ালা ইউসাললিহি" (মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়না))। যদি কোন মুসলমান নিজের পিতামাতাকে অথবা কোন মুসলিম সমাজ কোন ব্যক্তিকে কোন রোগে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং তার চিকিৎসা না করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে তাকে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করে ও অসম্মান করে। লক্ষনীয় ব্যাপার হলো, কোন ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে কোন সীমা নির্দেশ বা নির্দিষ্ট করা যায় না। কেননা তা স্থান, কাল, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। কোন বস্তু কোন সময়ে এবং জাতির মধ্যে আরাম–আয়েশের বস্তু হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। আবার সেই বস্তুই অন্য সময়ে বা ভিন্ন জাতির মধ্যে আবশ্যিক বস্তু হিসেবে মনে করা হতে পারে।

নিয়মিত স্থায়ী সাহায্য

যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম কি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় তা ওপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে। ইসলাম ফকির এবং কোন অক্ষম মিসকিন ও তার পরিবার–পরিজনের যৌক্তিক জীবনযাত্রার মানের জামানত প্রদান করে। ইসলাম এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদেরকে পুরো এক বছরের জীবনের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে আমরা আরো খানিক অতিরিক্ত যোগ করতে পারি। এমন মুসতাহিক ব্যক্তির জন্য এক ধরনের স্থায়ী ও নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত --এমন কি ধনী গরীবকে, সক্ষম

অক্ষমকে এবং রোজগারকারী বেকারকে বেকারত্ব দূরীকরণে সাহায্য করবে। আবু ওবায়েদ 'আল আমওয়াল' গ্রন্থে এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলোঃ একদিন হজরত ওমর (রাঃ) দ্বিপ্রহরের সময় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য মহিলা তার কাছে উপস্থিত। মহিলাটি এমন একজন লোকের খোঁজ করছিল, যে তার কল্যাণ করতে পারে। মহিলাটি বলতে লাগলো "আমি একজন মিসকিন মহিলা। আমার সন্তান রয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে যাকাত আদায় এবং তা বন্টনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সে আমাদেরকে কিছুই দেয়নি। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আমার জন্য তার কাছে কিছু সুপারিশ করে দাও।" তিনি নিজের খাদেম ইয়ারফাকে ডাকলেন এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে ডেকে আনতে পাঠালেন। মহিলাটি বললো, "তুমি যদি আমার সাথে তার কাছে যাও তাহলে অবশ্যই আমার কাজ হবে।" তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ সে এখনই করবে। ইয়ারফা মুহাম্মদ বিন মাসলামার কাছে গেল এবং বললেন, 'খলিফা তোমাকে ডেকেছেন।' ইবনে মাসলামা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন আসসালামু আলাইকুম। একথা শুনে মহিলাটি কিছুটা লজ্জিত হলো। হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে মাসলামাকে বললেন,"আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিদেরকে যাকাত আদায় এবং তা বন্টনের জন্য নির্বাচিত করে থাকি। যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমাকে এই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তখন তুমি কি জবাব দিবে?" এ কথা শুনে মুহাম্মদ বিন মাসলামার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "আল্লাহতায়ালা নবীকে (সঃ) আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁকে সত্য হিসেবে মেনে নিলাম এবং তাঁর নির্দেশাবলীও মানলাম। তিনি খোদার নির্দেশাবলীর ওপর পুরোপুরি আমল করলেন এবং যাকাত প্রভৃতির হকদার ফকির মিসকিনদেরকে যাকাত দান অব্যাহত রাখলেন। এই ভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রুহ কবজ নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) মুসলমানদের খেলাফতের সুযোগ দিলেন। তিনি যাকাতের ব্যাপারে সুন্নাতে নবীর (সঃ)-কে ওপর পুরোপুরি আমল করলেন। তাঁকেও আল্লাহ পাক মৃত্যু দিলেন। এরপর আমি খিলাফতের সুযোগ পেয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিদেরকে যাকাত আদায় ও তা বন্টনের জন্য নিয়োগ করে আসছি। এখন আমি যদি তোমাকে প্রেরণ করি তাহলে এই মহিলাকে চলতি বছর এবং আগের বছর দু' বছরের যাকাত দিবে। আমি জানিনা, সম্ভবত আমি তোমাকে নাও পাঠাতে পারি"। অতঃপর তিনি সেই মহিলার জন্য একটি উট আনালেন। তাকে কিছু আটা ও ঘি দিয়ে বললেন,এই সব নিয়ে নাও এবং খাইবারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো। কেননা আমি সেখানে যাচ্ছি। মহিলাটি খাইবারে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তিনি তার জন্য আরও

দুটি উট আনালেন এবং বললেন, উট দুটি নিয়ে নাও। মুহাম্মদ বিন মাসলামা দ্বিতীয়বার আসা পর্যন্ত দুটি তোমাদের জীবন যাত্রার জন্য যথেষ্ট হবে। আমি তাকে চলতি বছর অথবা গত বছর উভয় বছর যাকাতের অংশ তোমাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি"। এই ঘটনায় আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ), মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং গ্রাম্য মহিলা মিসকিনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা কি দিক নির্দেশ করে?

এই ঘটনা সেই কথারই দিক নির্দেশনা করে যে, মুসলমান শাসকের ইসলামী রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে নিজের জবাবদিহি এবং দায়দায়িত্বের কথা কতখানি অনুভূত হয়? এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমান সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য তার অধিকার কতটুকু অনুভূত হয় যা তাদেরকে মুসলমান রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। এ থেকে এটা জানা যায় যে, যাকাত সমাজের নিরাপত্তামূলক ভবনের মূল স্তম্ভ। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, যাকাত এক স্থায়ী এবং নিয়মিত চাঁদা। যদি কোন হকদার ব্যক্তি তা না পায় তাহলে তার এই হক সম্পর্কে তখনকার শাসকের নিকট অভিযোগ করে নিজের হক আদায় করে নিতে পারে। এ থেকে এও স্পষ্ট হয় যে, যাকাতের ব্যাপারে হযরত ওমরের (রাঃ) বাস্তব কর্মনীতি ছিল। এই নীতি প্রমাণ করে যে, হকদার ব্যক্তিকে এত পরিমাণ দাও যা তার জন্য যথেষ্ট হয় এবং আরো অতিরিক্ত পাওয়ার ব্যাপারে তার কোন আকাংখা না থাকে। সুতরাং প্রথমেই তিনি সেই গ্রাম্য মহিলাকে আটা ও ঘি এবং একটি উট দিলেন। অতঃপর আরো দুইটি উট দিলেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তোমাদের কাছে পৌছে গত উভয় বছরের যাকাত থেকে হক তোমাদের না দেয় তত দিন পর্যন্ত এসব তোমাদের জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট হবে। এ সবের পর এই ঘটনা এ কথারও স্পষ্ট সাক্ষ্য যে, হযরত ওমর (রাঃ) নিজের কর্মনীতিতে নতুন কিছু প্রচলন করেননি। বরং তিনি রাসূলে খোদার (সঃ) এবং প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের কর্মনীতিরই অনুসারী ছিলেন।

যাকাতের সম্পদ বন্টনে ইসলামের রাজনীতি

যাকাত বন্টনে ইসলাম যে দার্শনিকসুলভ ও ইনসাফ ভিত্তিক নীতি গ্রহণ করেছে তা বর্তমান যুগের (যে যুগে পেশকৃত জীবন ব্যবস্থাসমূহ ও আইন প্রণয়নকে কিছু মানুষ আধুনিক বরং অত্যাধুনিক বলে মনে করে।) সমগ্র উন্নত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মোকাবেলায় পেশ করা যায়। এ কথা সবারই জানা যে, জাহেলী ও অন্ধকার যুগে ইউরোপে কৃষক, শিল্পপতি, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিভাবে ট্যাক্স ও কর আদায় করা হতো। তারা সবাই নিজের হাতে পরিশ্রম করে গায়ের ঘাম পায়ে ঢেলে, বিনিদ্র রজনী জেগে এবং দিনভর হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে

নিজের রুজী কামাই করতো। মজুরের খুন রাঙা সম্পদ কিভাবে শাহানশাহ, বাদশাহ, আমীর অথবা সুলতানের আলীশান রাজধানীতে পৌছাতো। আর তারা এই সম্পদ নিজের সিংহাসন ও ক্ষমতা শক্তিশালী করণ, নিজের শান শওকতের প্রদর্শন, নিজের চাটুকার ও অনুসারীদের পিছনে খরচ করতো। নিজেদের প্রয়োজনের কিছু অতিরিক্ত সম্পদ যদি থাকতো তাহলে তা শহরের বিস্তৃতি এবং আরাম আয়েশ ও শহরবাসীর মনোতুষ্টির জন্য ব্যয় করা হতো। এর পরেও যদি কিছু সম্পদ বেঁচে যেতো তাহলে তা সে সব শহরের জন্য বরাদ্দ করা হতো, যেসব শহর শাহানশাহ অথবা সুলতানের দরবারের কাছের হতো। কিন্তু দূরদূরান্তের শ্রমজীবি মানুষের কাছ থেকে আদায়কৃত ট্যাক্স ও করলব্ধ সম্পদের কিছুই তাদের জন্য ব্যয় করা হতো না। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানদেরকে যখন যাকাত আদায়ের হুকুম দেওয়া হলো তখন মুসলমান শাসকদেরকেও এই হুকুম দেওয়া হলো যে, বিত্তবান এবং তাদের সম্পদের পবিত্রকরণের জন্য তাদের কাছ থেকে যাকাত নিতে হবে ও সমাজের অভাবী ও ফকির শ্রেণীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ এবং অভাবের নীচতা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং ন্যায় ও ইনসাফের যুগের প্রবর্তন হবে। খোদার তরফ থেকে যখন যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হলো তখন খোদার রাসূল (সঃ) যাকাতের কর্মচারীদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণের সময় এই নির্দেশ দিলেন যে, সেইসব এলাকার বিত্তবানদের যাকাত গ্রহণ করে সেইসব এলাকারই ফকির এবং মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করো। আগে মায়াজ বিন জাবালের (রাঃ) হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করিম (সঃ) তাকে ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সেখানকার বিত্তশালীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তথাকার ফকিরদেরকে দিয়ে দেবে। হযরত মায়াজ (রাঃ) খোদার রাসূল (সঃ)–এর নির্দেশ মোতাবেক আমল করেছিলেন এবং ইয়েমেনবাসীর যাকাত সেখানকার হকদারদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। বরং প্রত্যেক স্থানের যাকাত সেখানকার অভাবী এবং মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। যারা নিজের বংশীয় এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাদের ব্যাপারে এরা লিখিত পয়গামও প্রেরণ করেছিলেন। এই পয়গামে বলা হয়েছিলো যে, যাকাত ও ওশর তাদের বংশীয় এলাকাতেই ব্যয় করা হবে।

আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সঃ) সাদকা ও যাকাত প্রভৃতি আদায়কারী আমাদের এলাকায় এলেন। সে আমাদের বিত্তশালীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে আমাদের ফকিরদের মধ্যেই বন্টন করে দিলেন। আমি সে সময় এক এতিম বালক ছিলাম। যাকাতের সম্পদ থেকে সে আমাকে একটি উটনি দিয়েছিল। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহকে (সঃ) অনেক প্রশ্ন

জিজ্ঞেস করলো। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনাকে কি খোদাতায়ালা এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে আমাদেরই ফকিরদের মধ্যে তা বন্টন করে দেবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ।' আবু ওবায়েদ হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজের ওছিয়তে বলেছেন, 'আমি আমার পরে যারা খলিফা হবেন তাদেরকে এই ওছিয়ত করছি, এই ওছিয়ত..... এই ওছিয়ত করছি যে, গ্রামের লোকদের (বুদ্দু) সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারাই প্রকৃত আরব এবং তারাই ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আদায় করে ফকিরকে দিতে হবে।

হযরত ওমরের (রাঃ) জীবনেও এই নীতিই কার্যকর ছিল অর্থাৎ যেখান থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হতো সেখানেই তা বন্টন করে দেওয়া হতো। যাকাত, সাদকা এবং খিরাজ প্রভৃতি আদায়কারীরা এই অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসতো যে তাদের নিকট শুধুমাত্র পালানের নীচের কাপড় (যা তারা শরীরের চারপাশে জড়িয়ে রাখতো) এবং *ঠেস* লাগানোর লাঠি ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। হযরত সাঈদ বিন মুছাইয়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মায়াজকে (রাঃ) বনু কিলাব ও বনু সায়াদ বিন জবিয়ানের আদায়কারী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি যে যাকাত ও সাদকা আদায় করলেন তা সবই সেখানকার গরীব ও ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এমনকি যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তার নিকট সেই খেজুরের পাটিই ছিল যা তিনি ঘাড়ে করে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। ইয়ালা বিন উমাইয়ার সাথীবৃন্দ এবং তাদের মধ্যের কিছু লোক যাদেরকে হযরত ওমর (রাঃ) যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তারা বলেছেন যে, আমরা যাকাত ও সাদকা প্রভৃতি উসুলের জন্য বের হতাম এবং যখন সেই কাজ শেষে ফিরতাম তখন আমাদের কাছে শুধুমাত্র চাবুক থাকতো। যাকাত আদায় এবং তা বন্টনের এই পদ্ধতি যা রাসুসুল্লাহ (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন প্রবর্তন করেছিলেন, তার ওপরই পরবর্তীকালে আগমনকারী ন্যায় পরায়ণ মুসলমান শাসক, সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের মধ্যেকার ফকিহ্‌রা কায়েম ছিলেন। এই সব ফকিহকেই ইমাম হিসেবে মানা হয়। বস্তুত ইমরান বিন হাছিন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে যিয়াদ অথবা বনু উমাইয়া যুগের কোন একজন আমীরের তরফ থেকে কোন এলাকায় যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করা হয়। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন আমীর বললেন, "মাল কোথায়"? তিনি বললেন, "মাল আনার জন্য কি তুমি আমাকে পাঠিয়েছিলে"? আমরা যেখান থেকে রাসূলের (সঃ) যুগে মাল উসুল করতাম সেখানেই উসুল করেছি এবংম সেখানেই দিয়ে দিয়েছি ও সেখানেই দিতাম। ইমাম আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেছেন, এই সকল হাদিস প্রমাণ করে যে প্রত্যেক

এলাকার লোকের নিজের এলাকার সাদকা ও যাকাতের ওপর অগ্রাধিকার রয়েছে। কিন্তু সেখানে সাদকার লোক থাকতে হবে। আমাদের ধারণায় তাদের অগ্রাধিকার এ জন্য যে নবীর সুন্নাত এই মতের সহায়ক। তারা নিজের কওমের বিত্তবানদের ঘরের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাদের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক থাকে। কোন যাকাত আদায়কারী ভুলবশতঃ এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যায় এবং প্রকৃত পক্ষে প্রথম এলাকার বাসিন্দাদের তার বেশী প্রয়োজন হয় তাহলে সে সময়কার শাসক তা ফিরিয়ে দিতে পারে। যেমন ওমর বিন আবদুল আজিজ করেছিলেন এবং সায়ীদ বিন যোবায়ের ফতওয়া দিয়েছিলেন। ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী এবং হাসান বসরী ছাদকাহ এবং খায়রাত প্রদানে নিকটআত্মীয়দের অগ্রাধিকার দানকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু উবায়েদ বলেছেন, মানুষ শুধুমাত্র নিজের বিশেষ সম্পদ থেকে সাদকা প্রভৃতি প্রদানে এটা করতে পারে। কিন্তু যাকাত প্রভৃতিতে সমগ্র উম্মার হক রয়েছে। আর এই যাকাত উসুল এবং বন্টনের দায়িত্ব সমসাময়িক শাসকের। এতে কোন ব্যক্তির কোন ধরনের অপচয়ের অধিকার নেই। এই দুই বুজর্গের মত আবুল আল্গিয়ার একটি হাদিসে রয়েছে। তিনি যাকাত মদিনা মুনাওয়ারা থেকে নিয়ে যেতেন। আবু ওবায়েদ বলেছেন যে, আমাদের ধারণা হলো তিনি নিজের নিকটাত্মীদেঁরকে যাকাত দিতেন।

যেমন ইজমা হলো, যাকাত যে এলাকায় উসূল হবে সে এলাকাতেই তা বন্টন করতে হবে। তেমনি এ ব্যাপারেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি কোন বিশেষ এলাকার বাসিন্দাদের যাকাতের প্রয়োজন না থাকে। আর ঐ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন সেই এলাকায় হকদার না থাকে অথবা তাদের সংখ্যা কমে যায় এবং প্রচুর পরিমাণ যাকাত আদায় হয়। তাহলে অন্য এলাকায় মুসতাহিক ব্যক্তিদের প্রতি যাকাতের সম্পদ স্থানান্তর করতে পারে। এই যাকাতের সম্পদ দ্বিতীয় খাতেও খরচ করা যায় অথবা সেই এলাকার নিকটবর্তী এলাকায় প্রেরণ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইমাম মালিক উত্তম অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। কিন্তু কোন এলাকার বাসিন্দাদের যদি তা প্রয়োজন হয় তাহলে সে সময়কার শাসক ইজতেহাদের ভিত্তিতে অন্য এলাকার যাকাত সেখানে স্থানান্তর করতে পারে। সাখনুন থেকে বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মুমিনিন যদি খবর পান যে, অমুক এলাকার বাসিন্দাদের জন্য যাকাত প্রভৃতির অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে যে এলাকায় সাদকার প্রয়োজন পড়বে সেখানে তা স্থানান্তর করা তার জন্য জায়েজ। কেননা কোন প্রয়োজনের সময় সাদকা ও যাকাতের মুসতাহিকদেরকে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা মুসলমান মুসলমানের ভাই।

মুসলমান তাকে বন্ধুহীন ও অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে না। তার উপর জুলুমও করতে পারে না।

দুনিয়ার সর্ব প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা যাকাত

যাকাত ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রথম সুসংগঠিত আইন। এই ব্যবস্থা শুধু ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছামূলক ভাবে প্রদত্ত সাদকাতেই সীমিত নয়। বরং সরকারী মেয়াদী সাহায্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধরনের সাহায্যের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক অভাবী এবং তার পরিবার ও পরিজনের খানা পিনা, পোশাক, বাসস্থান ও জীবনের অন্যান্য অপচয় এবং বখিলি ছাড়া পূরণ হয়। এই সাহায্যের সীমা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। বরং মুসলিম রাষ্ট্রের ছায়াতলে যে সব অভাবী ইহুদি ও খৃষ্টান বসবাস করে তারাও এই সাহায্য থেকে উপকৃত হতে পারে। এই সেই সামাজিক নিরাপত্তা (Social security) যার ধ্যান-ধারণা এখন পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হয়েছে। তবুও তাদের ধারণা ইসলামের পেশকৃত সামাজিক নিরাপত্তার মাপকাঠি পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। ইসলামী ব্যবস্থায় প্রত্যেক অভাবী এবং তার পরিবার পরিজনের পূর্ণ নিরাপত্তার জামানত দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু তাদের চিন্তার উৎপত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুর্বলের প্রতি রহমের আবেগে আপ্লুত নয়। বরং বিভিন্ন বিপ্লব এবং কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের ভয়াবহ তুফান এবং বিশ্ব যুদ্ধ ও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সন্তুষ্টির আবেগই এই ধরনের ধ্যান-ধারণায় বাধ্য করে। বস্তুত সর্বপ্রথম পশ্চিমা দেশগুলোর তরফ থেকে সামাজিক নিরাপত্তার নিয়ম মাফিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১৯৪১ সালে। অন্য দিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক চুক্তিতে ঐক্যমত ঘোষণা করে যে, তাদের রাষ্ট্রের সমগ্র অধিবাসীর সামাজিক নিরাপত্তার বিধান থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এই সব পাশ্চাত্য দেশের শত শত বছর পূর্বে এমন এক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। এই বিধানের বাস্তবায়নও ইসলামী রাষ্ট্র করে থাকে। এবং প্রয়োজনের সময় ধনীদের কাছ থেকে ফকিরদের অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ পর্যন্ত করে থাকে। এ সত্ত্বেও কিছু লেখক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুরুর কৃতিত্ব ইউরোপকে দিয়ে থাকে। এবং আমাদের ঐতিহাসিক ও দ্বীনী উত্তরাধিকার অস্বীকার করে। ১৯৫২ সালে আরব লীগ দামেস্কে স্যোশাল স্টাডিজ নামক একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধ্যয়নই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল। এই সংস্থার ব্যবস্থাপক মিঃ ডানিয়াল সান জর্জ সামাজিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "অতীত যুগে বুভুক্ষ অবস্থায় মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য অভাবী ও ফকিরদের সাহায্য সহযোগিতার প্রশ্নে সরকারী প্রচেষ্টা শুরু ১৭শ শতাব্দী থেকে। এই সময়ে রাষ্ট্রের প্রাথমিক পদক্ষেপের কারণে

বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনগুলো সুসংগঠিতভাবে অভাবগ্রস্ত ও ফকিরদেরকে সাহায্য প্রদান শুরু করে।" মিঃ ডানিয়ালের উল্লিখিত বিবৃতি ইসলামের ইতিহাসে এবং যাকাতের আবশ্যিক তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। আমরা এর আগে সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে, ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা যাতে যাকাত আদায় ও তা বন্টনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। এটা ব্যক্তিগত ইহসান অথবা স্বেচ্ছামূলক সাদকার পর্যায়ে পড়ে না। বরং অভাবগ্রস্থদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে ফরজকৃত নির্দিষ্ট হক এবং যাকাত আদায়কারীদের জন্য তা আদায় ওয়াজিব।•এটা সরকারের তরফ থেকে আরোপিত ট্যাক্স থেকে ভিন্ন ধরনের। কেননা এটা একটা স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট ট্যাক্স। সরকার যদি তা কোন সময় উপেক্ষা করে এবং মানুষের কাছ থেকে আদায় না করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নিজের রবের সন্তুষ্টি, মন ও অন্তরের পবিত্রতার জন্য তা আদায় না করবে ততক্ষণ তার ইসলাম সঠিক এবং ঈমান পূর্ণ হবে না। মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে যে, সে তাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বের করে দেবে এবং গ্রহণকারীর উপর ইহসানের বড়াই করবে না ও মনোকষ্ট দেবে না। অভাবগ্রস্ত তা এমনভাবে গ্রহণ করবে যে গ্রহণের সময় সে মনে করবে ইসলামের শিক্ষা হলো আল্লাহ্র যাকাতের মালে তার অধিকার রয়েছে। এই সম্পদে আল্লাহ-তায়ালা নিজের কিছু সংখ্যক বান্দাহকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং মুসলমানদের জামায়াতের কাছে দাবী করেছেন যে যারা তা আদায় করবে না তাদের বিরুদ্ধে এই নির্দিষ্ট হকের জন্য যুদ্ধ করবে।

মিঃ ডানিয়েল বর্তমান যুগের সামাজিক নিরাপত্তার প্রকৃতি ও ধরন বর্ণনা করে বলেছেন, "আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনাসমূহের পার্থক্যপূর্ণ বৈশিষ্ট প্রাচীন যুগের ফকিরদের সাহায্য সহযোগিতার প্রচেষ্টার তুলনায় তার প্রয়োগ শুধু ফকিরদের ওপরই হয় না। বরং কোন গ্রুপ অথবা শ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তির ওপর হয়ে থাকে। যার আর একটি নির্দিষ্ট মান থেকে কম। আধুনিক ব্যবস্থা কতিপয় শর্তসহ এই সাহায্য-সহযোগিতা ফকিরদের একটি অধিকার হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত এবং তাতে সাহায্য আদায়ে নির্দিষ্ট হার এবং দানের যথাযথ নিয়ম রয়েছে। এছাড়া এই স্কীমে সেই জিল্লতি নেই যা ফকিরদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়ানো বরদাশত করতে হয়। এই স্কীম নাগরিক অধিকারের সেই অনুপস্থিতিরও ইতি টেনেছে যা ফকিরদের ছাদকা প্রদান প্রশ্নে প্রচীন ব্যবস্থায় পাওয়া যায়।"

মিঃ ডানিয়েল উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার ধারণা হলো অতীতে এইসব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো সামাজিক ব্যবস্থা পাওয়া যায় না। একথা পাশ্চাত্য জগত এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে বলা হলে তা ঠিকই আছে। কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাসকেও যদি এই দৃষ্টিতে

আনা হয় তাহলে তাদের এই দাবী সরাসরি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। কেননা সামাজিক নিরাপত্তার এই ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় পুরোপুরিই রয়েছে। এর আগে আমরা স্পষ্ট করে এসেছি যে, ইসলাম যাকাতকে ফরজ করার সাথে সাথে তাকে "জ্ঞাত হক" বলা হয়েছে। ইহসানের বড়াই করার এবং মনোকষ্ট প্রদানের কোন সুযোগই নেই। মুসলমান সরকার তা আদায় এবং ব্যয়ের জিম্মাদার। যাকাত সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যায় যার আয়ের কোন উৎস বা মাধ্যম নেই। যদি থাকেও তাহলে তা দিয়ে এত কম আয় হয় যা তার এবং তার পরিবার–পরিজনের প্রয়োজন পূরণ হয় না। এ থেকেও বড় কথা, যাকাতের উদ্দেশ্য হলো ফকিরদেরকে ধনী বানিয়ে দেওয়া এবং ধনী ও গরীবদের মধ্যকার আসমুদ্র হিমাচল পার্থক্য দূরীকরণ। আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তার ধ্বজাধারীরা স্বপ্নেও এইসব বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সামাজিক ব্যবস্থা পেশ করতে পারবে না।

বায়তুল মালের অন্যান্য আয়ে গরীবদের হক

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামে দারিদ্র্য, বুভুক্ষা এবং অভাব দূরীকরণে যাকাত এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ মাধ্যম। এখন আমাদেরকে তাতে এতটুকুন সংযোজন করে নিতে হবে যে, বাইতুলমাল অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের নির্ধারিত আয় দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও অভাব দূরীকরণে সুপরিকল্পিতভাবে বন্টন আবশ্যক। ইসলাম রাষ্ট্রের সম্পদ এবং সেই সরকারী ধন সম্পদ যার ব্যবস্থাপনা সরকার করে থাকেন ও যার আয় বায়তুলমালে জমা হয় তার ব্যয়েও এই নীতি আবশ্যিকভাবে সামনে রাখা হয় যে, সম্পদ শুধু বিত্তশীলদের মধ্যেই যেন আবর্তিত না হয়। তার মুনাফা ইনসাফের সাথে বন্টন করতে হবে এবং সমাজের বিভিন্ন ধরনের উঁচু নীচু মানুষকে এক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যদি যাকাত অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে সরকারের অন্যান্য আয় থেকে তাদের অভাব পূরণের কাজ করতে হবে।

গণিমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, খিরাজ এবং প্রত্যেক ধরনের ট্যাক্সে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রের অধিকার রয়েছে। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

"ওয়া'লামু ইন্নামা গানিমতুম মিন শাইয়িন ফা ইন্না লিল্লাহি খুমুছাহু ওয়ালির রাসূলি ওয়া লিজিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনা ওয়াবনিস সাবিলি" (আল আনফালঃ ৪১) –এবং তোমরা জেনে রাখ যে যা কিছু গণিমতের মাল তোমরা হাসিল করেছ তার এক–পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য।

"মা আফ্যা'ল্লাহু আলা রাসূলিহি মিন আহলিল কুরা ফা লিল্লাহি ও লির রাসূলি ওয়া লিজ্জিল কুরবা ওয়ালইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনি ওয়াবনিস সাবিলি কায় লা ইয়াকুনু দাওলা তান বাইনাল আগনিয়ায়ি মিন কুম" (আলহাসর) "ফায় হিসেবে যে মাল আল্লাহ বস্তিবাসীর কাছ থেকে রাসূলকে দিয়েছেন তা আল্লাহ, তার রাসূল, আত্মীয়,ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। যাতে এই মাল তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই ঘুরপাক বা আবর্তিত না হয়।"

ফকিহরা যাকাতের সম্পদে ফকিরদের অধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা যাকাতের মালকে সাধারণভাবে ব্যবহারকে বৈধ করেননি। যেমন সৈন্যদের বেতন ইত্যাদি বাবদ যাকাতের মাল ব্যয় করা যায় না। অবশ্য সরকারী বাজেটে যদি ঘাটতি দেখা দেয় এবং যাকাতের বাজেট যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে যাকাতের বাজেট থেকে ধার নিয়ে সরকারী বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা যায়। অতঃপর যখন সরকারী বাজেট উদ্বৃত্ত হবে তখন যাকাতের বাজেট থেকে ধারকৃত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের যাকাত ও সাদকার সম্পদ থেকে ব্যয়ের প্রশ্নে খোদা ভীতিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে। প্রত্যেক ফকিরকে সাদকার সম্পদ থেকে তার হক আদায় করবে এমনকি ফকির ও তার পরিবার পরিজনকে ধনী বানিয়ে দেবে। যদি কিছু মুসলমান গরীব থাকে এবং বায়তুল মালে সাদকা প্রভৃতি না থাকে তাহলে মুসলমান শাসক খিরাজের বায়তুল মাল থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এটা সাদকার বায়তুল মালের ওপর কোন ঋণ আরোপিত হবে না এজন্য আমরা পূর্বে পরিষ্কার ভাবে বলে এসেছি যে, খিরাজ প্রভৃতি মুসলমান ফকিরদের প্রয়োজনে ব্যয় করা যায়। কিন্তু যদি মুসলমান শাসককে সেনাবাহিনীর বেতন ইত্যাদি দানের প্রয়োজন হয় এবং খিরাজের বায়তুল মালে কোন সম্পদ না থাকে তাহলে সে সরকার বাইতুল মাল থেকে বেতন ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে। তবে বেতনের অংক খিরাজের বাইতুল মালের উপর ঋণ হিসেবে আরোপিত হবে। কেননা সাদকাতে শুধু ফকির-মিসকিনদেরই হক রয়েছে। এজন্য। যখন শাসকেরা সাদকার বাইতুল মাল থেকে অংশ অন্য খাতে ব্যয় করবে তখন তা বাইতুল মালের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। যাতে ফকিরদেরও অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ খিরাজের বাইতুল মালই ফকির ও অভাবীদের অভাব পূরণের সর্বশেষ মাধ্যম। কেননা এতে সমগ্র জাতির মালিকানা রয়েছে। আমীরুল মুমেনীন অথবা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এই সম্পদ নয়।

শায়খাইন নবী করিম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ফরমিয়েছেন, আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিজের সত্তা থেকেও বেশী মেহেরবান, স্নেহশীল ও শুভাকাঙ্খী। যে মুসলমান কোন মাল রেখে মারা যায় তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে

আর যদি কেউ ঋণগ্রস্থ অবস্থায় ছোট ছোট শিশু রেখে মারা যায় এবং তার কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার ঋণ আমি আদায় করবো এবং তার শিশুদের দায়–দায়িত্ব আমার জিম্মায় থাকবে।

মুসনাদে আহমাদে মালিক বিন আওস থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) নিম্নেবর্ণিত তিনটি কথা কসম খেয়ে খেয়ে বর্ননা করতেনঃ

১) আল্লাহর কসম ! কোন ব্যক্তি এই মালে (গণিমত এবং সাধারণভাবে ব্যয়যোগ্য ওয়াকফ) অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির তুলনায় বেশী হকদার নয় এবং আমি অন্যের তুলনায় বেশী হকদার।

২) আল্লাহর কসম। এমন কোন মুসলমান নেই যার এই মালে অংশ নেই।

৩) খোদার কসম। আমি যদি জীবিত থাকি , তাহলে ছানয়ায় রাখালকেও এই সম্পদের অংশ থেকে অবশ্যই প্রদান করবে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজের স্থানে ফসল ফলানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

হযরত ওমর (রাঃ) প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসই দলিল হলো যে, আমীরুল মুমিনীন উম্মাহর সাধারণ নাগরিকের মতোই হয়ে থাকেন। এই ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে তার কোন বেশী মর্যাদা নেই। গণিমতের সম্পদ প্রভৃতি থেকে তাকে আগে অথবা কারো থেকে বেশী দেওয়া যায় না। এমনিভাবে এ হাদিস একথারও দলিল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়ার অধীনে প্রত্যেক মানুষ সে যত বড় মর্যাদারই হোক না কেন সামষ্টিক সম্পদ থেকে নিজের হক ও প্রয়োজন মোতাবেক অবশ্যই নিজের অংশ নিতে পারেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) নিজের কিতাব আল খিরাজে সেই চুক্তির বিবরণ নকল করেছেন, যে চুক্তি হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ইরাকের খাইরা এলাকার খৃষ্টানদের সাথে সম্পাদন করেছিলেন। এই রাজনৈতিক দলিলে পরিষ্কারভাবে লিখা ছিল যে, তাদের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা,রোগ ও বার্ধক্যের প্রশ্নে নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তাদের খরচ–খরচা মুসলমানদের বাইতুল মালের দায়িত্বে থাকবে। ইতিহাসে এই সামাজিক নিরাপত্তার এটাই প্রথম উদাহরণ। আর এই নিরাপত্তা একজন বিজয়ী নেতা এমন লোকদের দিয়েছিলেন যারা যুদ্ধের মুকাবিলার শক্তি হারিয়ে সন্ধির আগ্রহী ছিল এবং বিজয়ীর দ্বীন কবুলের পরিবর্তে নিজের দ্বীনের ওপর কায়েম থাকতে চাচ্ছিল। চুক্তির শব্দাবলী খালেদ বিন ওয়ালিদের মুখেই শুনুনঃ

"আমি খাইরার অধিবাসীদের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যে বৃদ্ধ কোন কাজ করতে পারেন না অথবা সে কোন আকস্মিক মুসিবতের শিকার হয়ে পড়েছে অথবা ধনী ছিল বর্তমানে গরীব হয়ে গেছে এবং স্বধর্মাবলম্বীদের সাদকা ও খয়রাতের ওপর জীবন যাপনে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, তার জিজিয়া মাপ করে দেয়া হবে এবং

মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে দারুল হিজরত এবং দারুল ইসলামে অবস্থান করবে ততক্ষণ এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। কিন্তু যদি সে এ উভয় স্থান থেকেই বের হয়ে অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে মুসলমানদের উপর তার পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না।"

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এই সিদ্ধান্ত হজরত আবু বকরের (রাঃ) সাথে খিলাফতকালে নিয়েছিলেন। তার সাথে যেসব সাহাবা সে সময় যুদ্ধে শরীক ছিলেন তারাও হজরত খালেদের (রাঃ) একই মত দিয়েছিলেন। অতঃপর এই সিদ্ধান্তের কথা যখন হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে পৌছালো তখন তিনি এবং বড় বড় সহাবারাও এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। কেউই সিদ্ধান্তটি বাতিল করেননি। এই ধরনের কাজ যা কোন সাহাবী সম্পাদন করেন এবং যা অন্যান্য সাহাবী জানতে পারেন তাদের মধ্যে কেউই তা বাতিল করেন না তখন তা অনেক ফকিহর নিকটই ইজমা বলে পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) যুগের একটি ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে তিনি অমুসলিম প্রজার সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাদের ভরণ-পোষণ এমন এক সুন্নাত হয়ে গিয়েছিল যা ভবিষ্যতের আদিল খলিফার জন্য তা অনুকরণীয় এবং অবশ্য অনুসরণীয় হয়ে গিয়েছিল। কেননা ইনসাফ ভিত্তিক নীতি ও শরীয়তের আলোকে রচিত আইনের প্রশ্নে খোলাফায়ে রাশেদা যে নকশাই রেখে গেছেন তা দ্বীন ইসলামের একটি অংশ মনে করতে হবে আর মুসলমানদের ওপর ফরজ হলো তারা খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে এমনভাবে অনুকরণীয় মনে করবে যেমন রাসূলের (সঃ) সুন্নাতকে মনে করতো। এই প্রসঙ্গে রাসূলের (সঃ) ফরমান হলো ঃ

"অবশ্যই যে তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকবে সে অনেক মত-পার্থক্যের উদ্ভব দেখবে। সে সময় তোমাদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য হলো যে, তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে সঠিক পথের অধিকারী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে কঠোরভাবে পালন করবে এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তার ওপর চলবে।" (আবু দাউদ ও তিরমিজী) খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ বসরার শাসক আদি বিন আরতাতাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁকে কতিপয় ফরজ সম্পর্কে নসিহত করেন এবং বলেন, সে যেন নিজের এলাকায় তা মেনে চলেন ।তাঁর এই চিঠির গুরুত্বের কারণে বসরার জনগণকে তা পড়ে শুনানো হয়েছিল। চিঠির বিবরণ হলোঃ

"নিজের তরফ থেকে একথা খেয়াল রেখো যে যদি কোন জিম্মী বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং তার কর্মশক্তি লোপ পায় ও কাজ করতে অক্ষম হয় তাহলে মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে তাকে ওজিফা দেবে।

আমি খবর পেয়েছি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব এক সময় এক বৃদ্ধ জিম্মীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই বৃদ্ধ জিম্মী তাঁকে উপর্যুপরি প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমরা কি তোমার সাথে ইনসাফ করিনি যে যৌবনকালে তোমার কাছ থেকে জিযিয়া নিয়েছি। অতপরঃ তিনি মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে তার এত পরিমাণ বৃত্তি বা ওজিফা নির্ধারণ করলেন যা তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই নিরাপত্তা বা দায়দায়িত্ব শুধু মুসলমান ফকিরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম জিম্মী অধিবাসীদেরও এই অধিকার বা হক রয়েছে। সেও মুসলমানদের মত বাইতুল মালের সাহায্য–সহযোগিতা নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারের স্থায়ী আয়ের উৎস এত কম হয় যা দিয়ে ফকির মিসকিনের ভরণ পোষণ অসম্ভব এবং সমাজের লোকজনের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার আবেগও কম হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকরা আবশ্যিকভাবে ধনীদের সম্পদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবে। এই কর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে ফকিরদের সাহায্য এবং তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে সরকারের দায়িত্ব অনেক ব্যাপক। সরকারের দায়িত্ব শুধু এই নয় যে সে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং তার ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ করবে ও জুলুম–নির্যাতন বন্ধ করে শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ শুধু এও নয় যে ধনীদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং অক্ষম ও ফকিরদেরকে প্রাকৃতিক আইনের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে যাতে তারা এই আইনের চাপে পিষ্ঠ অথবা শেষ হয়ে যাবে। যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীন অর্থনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা এ্যাডাম স্মীথ প্রমুখ বলে থাকেন। তারা বলেন, সরকারের প্রথম এবং মৌলিক দায়িত্ব হলো সে চিন্তাশীলদেরকে অক্ষমদের হাত থেকে রক্ষা করবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তারা বলে থাকেন যে, সমাজের ব্যক্তিবর্গ শুধু অর্থনৈতিক উপাদান। অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং লাভের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের দ্বারা তারা সম্পৃক্ত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ পারস্পরিক গভীর সম্পর্কযুক্ত একটি পরিবার। এই সমাজের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সম্পর্ক অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্পর্কের চেয়েও গভীর ও মজবুত। এই সম্পর্কের বুনিয়াদ হলো ইমান এবং ইসলাম। যা সমাজের সকল ব্যক্তিকে একই পক্ষে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর এই এক লক্ষ্যের অভিসারী হওয়ার কারণে তাদের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান–ধারণা, আবেগ অনুভূতি, আইন–কানুন এবং শুরু ও

শেষের এক গভীর ঐক্য সৃষ্টি হয়। এজন্য ইসলাম সমাজকে একটি শরীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ–প্রতঙ্গ পারস্পরিক সম্পর্ক–যুক্ত। একে অপরের সাহায্যকারী এবং সাহায্যের হকদারও। একে অপরের উপকারী। আবার একে অন্যের ওপর প্রভাবও বিস্তার করে থাকে এবং প্রভাবিত হয়ও। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যাকে আমীরুল মুমেনীন বলা হয় তার মর্যাদা শরীররূপী সমাজের মাথার মর্যাদায় অভিষিক্ত। অন্য কথায় এটা সেই ব্যবস্থা যা সমাজের ব্যক্তি বর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্যের সংরক্ষণ করে থাকে। যাতে এই সম্পর্ক ও ঐক্যের ফল নিয়ে সমগ্র সমাজ উপকৃত হতে পারে।

সরকারের দায়িত্ব শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয় যে সে শুধু ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের হামলা থেকে হেফাজত করবে। বরং তার দায়িত্বের পরিধি এ থেকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। বস্তুত ইসলামে পরিবারের পিতা বা অভিভাবক যেমন-- তেমন কওমের আমীরের দায়িত্ব রয়েছে। এ জন্য বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত নবীর (সঃ) এক হাদিসে উভয়কে (জাতির শাসক এবং পরিবারের পিতা) পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে।

"কুললুকুম রায়িম ও কুললুকুম মাসউলিন আন রায়িয়াতিহি। ফালইনামু রায়িন ওয়া হুয়া মাসউলুন আন রায়িয়াতিহি ওয়ার রাজুলু ফি আহলি বাইতিহি রায়িন ওয়া হুয়া মাসউলুন আন রায়িয়াতিহি।" তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং নিজের প্রজা সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। শাসক বা আমীর জাতির রাখাল এবং নিজের প্রজা সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের পরিবারের রাখাল (পিতা) তাকে নিজের প্রজার (পরিবার) ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে।

যেমন পিতার দায়িত্ব শুধু এই নয় যে, সে শুধু নিজের পরিবারের হেফাজত করবে। বরং সে তাদের ভরণ–পোষণ, প্রশিক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম রাখার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। এমনিভাবে জাতির শাসককেও সেই সকল লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে যাদেরকে আল্লাহতায়ালা তার প্রজা বানিয়েছেন। হজরত ওমর (রাঃ) বলতেন, "যদি ইরাকে কোন খচ্চর হোচট খেয়ে পড়ে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ জুল–জালাল জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি কেন সেই খচ্চরের জন্য রাস্তা সমান করিনি?

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া নামক গ্রন্থে হাফিজ ইবনে কাসির হজরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রঃ) সম্পর্কে এক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজের স্ত্রী ফাতিমা বলেছেনঃ আমি একদিন তার কাছে গিয়ে দেখি তিনি নিজের মুখমন্ডল নিজের হাতের ওপর রেখে জায়নামাজে বসে রয়েছেন এবং অশ্রু তার দুই

গন্ডদেশ বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে ফাতিমা আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুক! আমার ওপর উম্মাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমি ভুখা-নাঙ্গা মানুষ, অসহায় রোগী, উপায়হীন ইয়াতিম, অসহায় সম্বলহীন বিধবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত, মজলুম কয়েদী, মুসাফির, অধিক সন্তান এবং কম বিত্তের লোকজন এবং নিজের রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রান্তরে বসবাসকারী এই সব লোক সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে অনুভব করলাম যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) উল্লিখিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করবেন। আমি ভীত হয়ে পড়েছি যে, আমি এই মামলায় নিজের কোন সাফাই পেশ করতে পারবোনা এজন্য আমার নিজের ওপর রহম এসে গেছে এবং আমি কাঁদছি"।

যখন জনগণ হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজের নিকট বাইয়াত করলো এবং তাঁর খিলাফত কায়েম হয়ে গেল তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর গোলাম তাঁকে বললো, "কোন কারণে আপনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ? অথচ এই সময়তো দুশ্চিন্তা ও চিন্তা-ভাবনার সময় নয়।" তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষিত করুক ! আমি কেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবো না। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের হক আদায়ের জন্য আমার কাছে দাবী জানাচ্ছে। তারা তাদের হক বা অধিকারের ব্যাপারে আমাকে লিখুক বা না লিখুক।" এই রাশেদ খলিফার দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমে বসবাসকারী প্রত্যেক উম্মতের ব্যাপারে নিজেকে আল্লাহতায়ালার নিকট জবাবদিহী করতে হবে বলে মনে করেছেন এবং এই অনুভূতি রাখতেন যে প্রত্যেক উম্মাত বিশেষ করে অসহায়, দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ, বিধবা এবং ইয়াতিমের অধিকার আদায় তার ওপর ফরজ। সে নিজের অধিকারের কথা লিখিতভাবে বা সাক্ষাৎ করে জানিয়ে থাকুক বা না থাকুক।

ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম, ভালো ও উত্তম কাজের দাওয়াত প্রদান, ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। ন্যায় ও ইনসাফ এবং ভালো কাজের বিপরীতধর্মী ব্যাপার হলো দুর্বল ও অসহায় লোক ভুখা থাকবে এবং ফকির-মিসকিন খানা-পিনা, পোশাক, বাসস্থানের মত জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে মাহরুম থাকবে। বস্তুত সমাজের বিত্তশালীদের নিকট যথেষ্ট সম্পদ অহেতুক পড়ে থাকবে-এটা কোন ক্রমেই হতে পারে না। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সমস্যা সমাধান এবং ফকিরদের স্বচ্ছল জীবন প্রদানে বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বনও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যাতে সমাজে পারস্পরিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হাসিল হয়। এই মাধ্যম স্থান, কাল ভিন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হতে পারে। এবং ইসলামী

উম্মাহর ক্ষমতাবান ও বিজ্ঞ লোকদের জন্য ইজতিহাদের পথও খোলা রয়েছে। আমি দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে উদাহরণ স্বরূপ অনেক পন্থার মধ্যে শুধু একটি পন্থার কথাই উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি। এই পন্থায় হযরত ওমর (রাঃ) অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মদিনার নিকট 'রাবযাহ' নামক এক খন্ড জমি সরকারী মালিকানায় আনলেন। যাতে মুসলমানদের গবাদি পশু চরতে পারে। কিন্তু তিনি সরকারী মালিকানায় আনাই যথেষ্ট মনে করলেন না। বরং তিনি ফকির-মিসকিন এবং কম আয়ের মুসলমানদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলেন। যাতে তারা বিনা ব্যয়ে চারণ ভূমিকে নিজেদের গবাদি সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারেন এবং সরকারের কাছে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা না চান। এই উদ্দেশ্য হজরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশে সুস্পষ্ট রয়েছে। তিনি চারণভূমিটির তত্ত্বাবধায়ক হুনির প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে হুনি ! মানুষের সাথে নরম ব্যবহার এবং মজলুমের দোয়াকে ভয় করো। কেননা তাদের দোয়া কবুল করা হয়। কম উট এবং কম বকরীর মালিকদেরকে চারণ ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দেবে। ইবনে আফফান ও ইবনে আওয়াফের গবাদি পশুকেও (অর্থাৎ উম্মাতের আমীরদের উট ও ভেড়া বকরী) থাকতে দিও কেননা গবাদিপশু হালাক হয়ে গেলে তারা নিজেদের অন্য ক্ষেত এবং খেজুরের বাগানের দিকে ধাওয়া করবে। অর্থাৎ তাদের নিকট অন্য সম্পদ এবং আমদানির মাধ্যম রয়েছে। আর এই সব মিসকিনের (কম উট এবং বকরীর মালি) গবাদি পশু হালাক হয়ে গেলে নিজের সন্তান-সন্তুতি সহ আমার কাছে এসে দোহাই দিয়ে বলবে, "হে আমীরুল মুমিনীন। আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করবো? এজন্য তাদেরকে ধন সম্পদ সরবরাহ করা থেকে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।" (কিতাবুল আমওয়াল, আবু ওবায়েদ, ২৯৯ পৃঃ)।

হজরত ওমরের (রাঃ) উল্লিখিত নির্দেশে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই রয়েছে। এই নির্দেশে আমরা তিনটি হিসাব পাই। প্রথমত মুসলমান সরকারের জন্য এটা আবশ্যক যে, সকল কম সম্পদ ও কম আয়ের মুসলমানদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে এবং তাদের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যাতে তারা কাজ করে রোজগার করবে এবং ধনী হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যদি ধনী ও বিত্তশালীদের উন্নয়নের প্রশ্নটি খাটোও করতে হয় এবং তাদের সম্পদ লাভের ও আয়ের কিছু কিছু মাধ্যম থেকে বঞ্চিতও করতে হয় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বাধাও দিতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। যেমন হজরত ওমরের (রাঃ) এই কথায় স্পষ্ট। কথাটি তিনি বলেছিলেন চারণভূমির তত্ত্বাবধায়ককে। তিনি বলেছিলেন, "কম উট ও বকরীর মালিকদেরকে চারণভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দিও এবং ইবনে আফফান ও ইবনে আওফের গবাদি পশুকে থাকতে দিও।"

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, যদি তার আয়ের মাধ্যম ধ্বংস হয়ে যায় এবং রুটি রুজির কোন মাধ্যম না থাকে তাহলে সে তৎকালীন শাসকের সামনে হাজির হয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য দোহাই দিতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগার থেকে সাহায্য প্রদানের দাবীও সে করতে পারবে। তৎকালীন শাসকের অথবা সরকারের তার দাবী পূরণ এবং তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। যেমন হজরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ "এবং যদি এই মিসকিন-- যদি তার গবাদি পশু হালাক হয়ে যায় তাহলে সে তার নিজের সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে দোহাই দেবে যে, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করবো?"

তৃতীয়তঃ আমরা এখান থেকে বাস্তবসম্মত হিকমত লাভ করে থাকি। সেই হিকমত হলো, ফকির-মিসকিনদের মধ্যে যারা কাজ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কোন কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। এবং কম আয়ের মুসলমানের আয়ের মাধ্যমের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে ফকির ও কম আয়ের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এবং শ্রমের কারণে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না থাকে ও বাইতুল মালের ওপর বোঝা হয়ে না যায়। এই কথা হজরত ওমরের (রাঃ) সেই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, "ধন সম্পদের চেয়ে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।"

৫

যাকাত ছাড়া অভাব দূরীকরণে ইসলামের অন্যান্য পন্থা

যাকাত ছাড়াও মালের আরও কতিপয় হক রয়েছে। বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব হক আদায় মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। এ সবের উদ্দেশ্যও ফকিরকে সহযোগিতা দান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দী থেকে দারিদ্র্য ও অভাব নির্মূল করণ। হকগুলো হলোঃ

১– প্রতিবেশীর হক

প্রতিবেশীর হক সংরক্ষণের নির্দেশ আল্লাহতায়ালা কুরআন মজিদে দিয়েছেন। রাসূলে খোদা (সঃ)ও হাদীসে প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং প্রতিবেশীর মান–ইজ্জত রক্ষাকে ঈমানের দাবী ও তাকে কষ্ট প্রদান এবং তার হক সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শককে নেতিবাচক মুসলমানিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

"ওয়া বুদুল্লাহা ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়ান ওয়া বিল ওয়ালিদানি ইহসানা। ওয়া বিজিলকুরবা ওয়ালজারি জিলকুরবা ওয়ালজারিল জুনুবি ওয়াস সাহিবি বিল জানবি।" (আননিসাঃ ৩৫) "আল্লাহর ইবাদাত কর। কাউকেই তার অংশীদার বানিওনা এবং নিজের পিতা মাতা, আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয়, পড়শী ও অনাত্মীয় পড়শী এবং পাশে যারা বসে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।"

নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান রাখে তার উচিত সে যেন নিজের প্রতিবেশীর সম্মান করে" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। "নিজের প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করো, মুসলমান হয়ে যাবে" (ইবনে মাজাহ) "জিবরাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর প্রশ্নে অব্যাহতভাবে ওসিয়ত করতে থাকলেন। আমার ধারণা হতে লাগলো যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেবেন" (বুখারী, মুসলিম)

"সেই ব্যক্তি মুমিন নয় যে রাতে পেট পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী তার পাশে অভুক্ত থাকে এবং সে তা জানে" (তিবরানী বায়হাকী)। "কোন এলাকার বাসিন্দাদের

মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এক রাত অভুক্ত থাকে তাহলে তারা আল্লাহর হিফাজত এবং শান্তি থেকে বেরিয়ে যায়।" প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ প্রশ্নে সবচেয়ে উত্তম কথা এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "তুমি নিজের প্রতিবেশীকে রান্না করা খাবারের সুঘ্রাণ দিয়ে কষ্ট দিওনা। বরং তুমি নিজের রান্না করা খাবার থেকে পাত্র ভরে দিয়ে দাও। এবং যখন তুমি কোন ফল কিনবে তখন নিজের প্রতিবেশীকে তা থেকে তোহফা হিসেবে পাঠিয়ে দাও। যদি তুমি পাঠাতে না চাও তাহলে তা লুকিয়ে ভেতরে নিয়ে যাও এবং তোমার বাচ্চা যেন তা নিয়ে বাইরে না যায়। নচেৎ তা দেখে প্রতিবেশীর বাচ্চার মনোঃকষ্ট হবে।" হযরত আবুজর (রাঃ) ফরমিয়েছেন, "আমাকে আমার দোস্ত হজরত মুহাম্মদ (সঃ) ওসিয়ত করেছেন যে, যখন তুমি কোন কিছু রান্না কর, তখন তার শুরবা বেশী করে বানাও।" প্রতিবেশী তারাই নয় যাদের ঘর তোমাদের ঘরের সাথে মিলিত। বরং এই প্রশ্নে সাহাবীদের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ৪০টি ঘর প্রতিবেশীর সংজ্ঞায় পড়ে। কতিপয় সাহাবা (রাঃ) বলেছেন, ঘরের চার পাশের প্রত্যেক দিকের চল্লিশ চল্লিশ ঘর। এই জন্য প্রত্যেক মহল্লার বাসিন্দা একে অপরের প্রতিবেশী হিসেবে পরিগণিত। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "আমি বললাম হে রাসুল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। একজনের ঘরের দরজা আমার ঘরের দরজার সম্পূর্ণ সামনে এবং অন্যের একটু দূরে। কোন কোন সময় আমার কাছে তাদের দেওয়ার জন্য এমন জিনিষ থাকে যা তাদের উভয়কে দেওয়া যায় না। এই অবস্থায় কোন প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার? তিনি ফরমালেন, যার দরজা তোমার ঘরের দরজার সামনে।"

ইসলাম প্রতিটি মহল্লাকে এমন এক ইউনিটে পরিণত করতে চায়, যার প্রতিটি বাসিন্দা স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভরণ-পোষণ করে। নিজেদের মধ্যেকার দুর্বলের সাহায্যকারী হয়। অভুক্তকে খাবার খাওয়ায়। বস্ত্রহীনকে কাপড় পরায়। যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুল (সঃ) তাদের হিফাজত করেন না। এবং তারা মুমিন সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখারও অধিকার রাখে না। প্রতিবেশীর উপর প্রতিবেশীর হক ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচারের মধ্যে একটি উত্তম বিষয়। প্রতিবেশী যদি অমুসলিমও হয় তাহলেও এই শিষ্টাচার রক্ষা করতে হবে। মুজাহিদ বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রাঃ) কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর এক গোলাম একটি ভেড়া জবাই করে তার চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি ফরমালেন, হে গোলাম ! চামড়া ছাড়ানো হলে তুমি প্রথম আমার ইহুদী প্রতিবশীকে গোশত দিবে। এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। গোলাম তাকে বললো, আপনি বার বার একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল আমাদেরকে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বার বার ওসিয়ত করেছেন। এমন কি আমাদের সন্দেহ হতে লাগলো যে তিনি (সঃ) প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেবেন।"

২– ঈদুল আজহার কুরবানী

হজরত ইমাম আবু হানিফার (রঃ) নিকট নিম্নের হাদীস মুতাবিক প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলমানের ওপর ঈদুল আজহার কুরবানী ওয়াযিব। হাদীসটি হলোঃ যে ব্যক্তি স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও কুরবানী দিতে চায় না সে আমাদের ঈদগাহের নিকটেও যেন না আসে (আহমদ, ইবনে মাজাহ)।

৩– কসম ভঙ্গ করা

কসম ভঙ্গের প্রশ্নে আল্লাহর ইরশাদ হলোঃ "ফা কাফফারাতুহু ইতয়ামুন আশারাতা মাসাকিনা আওসাতুন মা তুতয়িমুনা আহলিকুম আও কিসওয়াতুহুম আওতাহরিরু রাকাবাতিন" (কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো দশ মিসকিনকে সেই মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়ানো যা তুমি নিজের বাল বাচ্চাকে খাইয়ে থাক অথবা তাদের কাপড় পরাও অথবা একটি গোলাম আজাদ করো। যদি এই ক্ষমতা না থাকে তাহলে তিনটি রোযার নির্দেশ রয়েছে)।

৪– জিহার

যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলে দেয়, তুমি আমার জন্য আমার মা অথবা বোনের পেছনের মত। তাহলে নিজের কথার কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত সে তার ওপর হারাম হয়ে যায়। একটি গোলাম আজাদ করা হলো এর কাফফারা। যার গোলাম আজাদ করার সঙ্গতি নেই সে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।

৫–রমযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস করা

রমযান মাসে রোযা রেখে সহবাসকারীরও সেই কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে যা জিহারকারীর ওপর নির্ধারিত হয়েছে।

৬– বৃদ্ধ ও চির রোগা ব্যক্তিদের ফিদিয়া

সেই বৃদ্ধ এবং চিকিৎসার বাইরের চির রোগা ব্যক্তি যে রমযানে রোযা রাখতে পারে না সে রমযানের প্রতিটি রোযার পরিবর্তে এক মিসকিনের খাওয়ার সমান খাবার ফিদিয়া দিয়ে থাকে। যেমন কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "ওয়াল্লাজিনা য়ুতিকুনাহু ফিদ্‌য়াতুন তায়ামু মিসকিনিন" (এবং যে ব্যক্তি রোযা রাখতে সক্ষম কিন্তু বার্ধক্য অথবা চির রোগের কারণে রাখেনা তাহলে সে ফিদিয়া দেবে)। এক রোযার ফিদিয়া এক মিসকিনের খাবার খাওয়ানো। গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী মহিলার নিজের

জীবন অথবা নিজের সন্তানের জীবনের ভীতি থাকলে কতিপয় ফকিহর মতে সেও ফিদিয়া দিয়ে রোযা ছাড়তে পারে।

৭– হাদি

কোন হাজী অথবা উমরাহকারী উট, গরু, অথবা বকরী নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে কুরবানী করে।

(ক) ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর মধ্যে কোন কাজ করে ফেললে তার কাফফারা হিসেবে যে কুরবানী দেওয়া হয়

(খ) হজ্জে তামাত্তু (উমরাহ এবং হজ্জ দুই ইহরামে করা)

(গ) হজ্জে কিরান (উমরাহ এবং হজ্জ একই ইহরামে করা)

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেন ঃ

ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু লা তাকতুলুস সাইদা ওয়া আনতুম হুরুমুন ওয়া মান কাতালাহু মিনকুম মুতায়ামমিদান ফা জায়াউন মিসলুমা কাতালা মিনান নায়ামি ইয়াহকুমু বিহি জাওয়া আদলিম মিনকুম হাদইয়াম বালিগাল কা'বাতি আও কাফফারাতুন তায়ামু মাসাকিনা (মায়িদাহঃ ৯৫)

"হে ঈমানদার লোকেরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করোনা। এবং যদি তোমাদের মধ্যে কেউ জেনে শুনে এমন কাজ করে ফেলে তাহলে যে জন্তু সে মেরেছে সেই ধরনের একটি জন্তুকে সে গবাদি পশুর মধ্য থেকে দিয়ে দেবে। এর সিদ্ধান্ত তোমাদের মধ্যেকার দুজন আদিল ব্যক্তি দেবে। আর এই নযরানা কা'বা শরীফে পৌছাতে হবে। তাকে এই গুনাহর কাফফারা হিসেবে কতিপয় মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে হবে"।

ফামান তামাত্তায়া বিল উমরাতি ইলাল হাজ্জি ফামাস তাই সারা মিনাল হাদয়্যি (আল বাকারাঃ ১৯৬)। "যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর ফায়দা উঠাবে সে সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী দেবে।"

এই কুরবানী ফরজ করার শরীয়তের লক্ষ্য হলো ফকীরকে গোশত খাওয়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এই কুরবানীর পশুর মূল্য অথবা তার দ্বিগুণ মূল্যও সাদকা হিসেবে আল্লাহ গ্রহণ করেন না। এর কারণ এবং হিকমত আল্লাহই ভালো জানেন। বস্তুত আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

ফাকুলু মিনহা ওয়া আতয়িমুল বায়িসাল ফাকিরা (হজ্জঃ২৮) "এই কুরবানী থেকে নিজেও খাবে এবং অস্বচ্ছল অভাবীকেও দেবে।"

ফাকুলু মিনহা ওয়া আতয়িমুল কানিয়া ওয়াল মু'তাররা কাজালিকা সাখখারনাহা লাকুম লায়াল্লাকুম তাশকুরুন (হজ্জ ঃ ২৬) "কুরবানী থেকে নিজেও খাও ও তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পেতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং যারা নিজের অভাবের কথা

পেশ করে তাদেরকেও খাওয়াও। এই সব জন্তুকে আমরা এইভাবে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

৮— ফসল কাটার হক

আল্লাহতায়ালা কুরআন মজিদে ফরমিয়েছেন ঃ "ওয়া হুয়াল্লাজি আনশায়া জান্নাতিল মারুশাতিন ওয়া গাইরা মারুশাতিন ওয়াননাখলা ওয়ায যারয়া মুখতালিফান উকুলুহু ওয়ায যাইতুনা ওয়ার রুমানা মুতাশাবিহান ওয়া গাইরা মুতাশাবিহিন কুলু মিন সায়ারিহি ইজা আসমারা ওয়া আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসারিহি (আল আনয়ামঃ ১৪১)

"সেই আল্লাহই যিনি বিভিন্ন ধরনের বাগান এবং খেজুর ও অন্যান্য বাগিচা সৃষ্টি করেছেন। খেত বানিয়েছেন। যা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্য হাসিল হয়। যাইতুন এবং আনারের গাছ বানিয়েছেন যার ফল আকার ও স্বাদে ভিন্ন ধরনের। এই ফল পারার পর তা খাও এবং আল্লাহর হক আদায় কর যখন এই ফসল কাটো।" এই আয়াতের 'আল্লাহর হক' এর অর্থ যাকাত নয়। বরং যাকাত ছাড়া কিছু দেওয়া। যা ফসলের মালিকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের এক জামায়াত এই মত উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে তার চারপাশের গরীব এবং মিসকিনদের প্রয়োজন সামনে রেখে যত ইচ্ছা তত দেবে। সুতরাং এই "হক এর তাফসিরে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলো উপহার অথবা সাদকা। যা ফসলের মালিক নিজের যাকাত ছাড়া দেয়।"

হযরত আতা বলেছেন, "তার অর্থ হলো ফসল কাটার সময় ফসলের মালিক সহজভাবে যা দিতে পারে তা সে সময় উপস্থিত গরীব ও মিসকিনদেরকে দিয়ে দেবে। আর এটা যাকাত হবে না।" হজরত মুজাহিদ বলেছেন, "ফসল কাটার সময় আগত মিসকিনদেরকে ফসল থেকে যা দিয়ে দেওয়া যায়।" ইবনে কাসির (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহতায়ালা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন যারা নিজেদের বাগানের ফল পাড়ে এবং তা থেকে সাদকা দেয় না। যেমন সূরায়ে আল কলমে বাগানের মালিকদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।"

ফকির ও মিসকিনদের প্রয়োজন পূরণের অধিকার

এই অধিকার অন্যান্য সকল অধিকারের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মুসলিম সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে তাকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন ন্যূনতমভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা এবং তার পরিবার–পরিজনের ভরণ পোষণ করতে হবে। যদি যাকাতের তহবিল থেকে এই লক্ষ্য হাসিল হয়ে যায় তাহলে ভালো। যদি

যাকাতের মাল অথবা বাইতুল মালের অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে ফকির-মিসকিন ও তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ভালোভাবে না হয় তাহলে মুসলমানদের সম্পদে যাকাত ছাড়াও ফকির-মিসকিনদের অধিকার রয়েছে। যেমন তিরমিজী শরীফে ফাতিমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সঃ)কে যাকাত প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন, "মুসলমানদের সম্পদে যাকাত ছাড়াও এক অধিকার রয়েছে। অতঃপর তিনি সুরায়ে বাকারার এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

লাইসাল বিররা আন তুয়াল্লু উজুহাকুম কিবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়া লাকিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল মালায়িকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান নাবিয়্যিনা। ওয়া আতাল মালা আলা হুব্বিহি জাবিয়্যিল কুরবা . ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনি ওয়াবনাস সাবিলি ওয়াস সায়িলিন ওয়া ফির রিকাবি। ওয়া আকামাস সালাতা ওয়া আতায্ যাকাতা। (আল-বাকারাহঃ ১৭৭) "এইটাই নেকী নয় যে তুমি নিজের চেহারা পূর্ব দিকে করে নিলে অথবা পশ্চিম দিকে। বরং নেকী হলো এই যে, মানুষ আল্লাহকে, আখিরাতের দিন, ফিরিশতা, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ এবং তাঁর পয়গাম্বরদেরকে অন্তর দিয়ে মানবে এবং আল্লাহর মুহাব্বতে নিজের পছন্দনীয় মাল আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির সাহায্য কামনা করে হস্ত প্রসারণকারী এবং গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে খরচ করে। নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।"

নবী করিম (সঃ) এই আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করার কারণ হলো যে, এতে প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম এবং মিসকিনকে মাল দান করাকে নেকী বলা হয়েছে। এরপর নামাজ কায়েম এবং যাকাত দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা নেকী ও তাক্বওয়ার উপাদান এবং মূল স্তম্ভ। এটা এরই দলিল যে যাকাত ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন ও মিসকিনদেরকে কিছু দিতে থাকা ওয়াজিব।

এ সত্ত্বেও একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে কুরআনের কোন আয়াত অথবা হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। তবুও কুরআন এবং হাদীসে তার প্রমাণাদি সূর্যের চেয়েও প্রোজ্জল রয়েছে। কেননা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইসলামী ব্যবস্থার ধরন-ধারণ মুতাবেক ইসলামী সমাজে পারস্পরিক নিরাপত্তা এক ফরজের মর্যাদা রাখে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও হামদরদী এমন এক ফরজ যা আদায় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নবী করিম (সঃ) মুসলিম সমাজের নকশা পেশ করে বলেছেন যে, মুমিন পারস্পরিক প্রাচীরের মত। যার বিভিন্ন অংশ একে অপরের স্থিতিশীলতা এবং মজবুতির কারণ হয়। পারস্পরিক প্রীতি রহম-করম এবং বিপদে মুমিনদের জামায়াত এক শরীরের মত হয়ে থাকে। এই শরীরের কোন এক অংশে

যদি ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে অন্য অংশে জ্বর ও অজ্ঞানতার শিকার হয়ে ব্যথার অংশীদার হয়ে যায়। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে বন্ধুহীন ও অসহায় ছেড়ে দেয় না। কোন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তিও রাতে অভুক্ত থেকে ঘুম থেকে জাগে তাহলে সেই এলাকা আল্লাহর হেফাজত থেকে বেরিয়ে যায়।

এইসব হাদীস থেকে প্রথমে কুরআন মজিদের আয়াতে মিসকিনকে উপেক্ষাকারীদেরকে এবং ফকির ও অসহায়দেরকে জুলুম নির্যাতনের নিশানা বানানোকারীদেরকে ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কুরআন-মজিদে সুরায়ে মুদদাসসিরে আখিরাতের দৃশ্যসমূহের একটি দৃশ্য পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণবাহুওয়ালা ব্যক্তিদের নিজেদের বাগানে যে দৃশ্যের অবতারণা হবে। তারা একে অপরকে সত্য বা হকের অস্বীকৃতি ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। অস্বীকৃতিকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যখন দোযখের আগুনের লেলিহান শিখায় পরিবেষ্টিত হবে তখন দক্ষিণবাহু বাম বাহুওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমাদের ওপর কেন এই আযাব নাযিল হয়েছে? জবাবে তারা বলবে যে, মিসকিনের হক নষ্ট করা এবং তাদেরকে ভুখা নাঙ্গা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কারণে এই আযাব নেমে এসেছে। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ কুল্লু নাফসিম বিমা কাসাবাত রাহিনাতুন ইল্লা আসহাবাল ইয়ামিনি ফি জান্নাতিন ইয়াতাসা আলুনা য়ানিল মুজরিমিনা মা সালাকাকুম ফি সাকারিন কালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিনা ওয়ালাম নাকু নুতয়িমুল মিসকিনা (আল–মুদদাসসির ঃ ৩৮–৪৪)

"প্রতিটি প্রাণী স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহান বন্দী। দক্ষিণ বাহুওয়ালা লোকদের ছাড়া। তারা জান্নাতসমূহে থাকবে। সেখানে তারা অপরাধী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ জিনিষটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না, মিসকিনদের খাবার খাওয়াচ্ছিলাম না।"

সূরায়ে আল কলমে আল্লাহতায়ালা বাগিচাওয়ালাদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীতে বলা হয়েছে, পারস্পরিক ওয়াদা করেছিল যে তারা রাতে ফল পাড়বে। যাতে মিসকিনরা বাগানের ফল থেকে মাহরুম হয়। তারা ফল পাড়ার দিন কিছু নেওয়ার জন্য এসে যেত। একদিকে তারা পারস্পরিক ওয়াদা করলো। অন্যদিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর আযাব নাজিল হলো। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ ফাতাফা আলাইহা তায়িকুম্ মিররাব্বিকা ওয়াদুম নায়িমুনা ফাআসবাহাত কাস্সারিমি ফাতানাদাও মুস্বিহিনা আনিগদু আলা হারসিকুম ইনকুনতুম সারিমিনা ফানতালাকু ওয়াদুম ইয়াতাখাতাফুনা আনলা ইয়াদ খুলাননাহাল ইয়াওমা আলাইকুম মিসকিনুন ওয়া

গাদাও আলা হারদিন কাদিরিনা ফালাম্মা রাআওহা কালু ইন্নালাদাললুনা বাল নাহনু মাহরুমুন। কাযালিকাল আযাবু ওয়াল আযাবুল আখিরাতি আকবারু লাওকানু ইয়া'লামুন (আল কালামঃ ১৯–৩৩)। "রাতের বেলা তারা নিদ্রামগ্ন হয়েছিল, এই সময় তোমার খোদার নিকট থেকে একটি বিপদ সেই বাগানের ওপর আপতিত হল এবং তার অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মত হয়ে গেল। সকালে তারা একজন অপরজনকে ডাকলো যে, ফল পাড়তে হলে খুব সকাল সকালেই নিজেদের ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হয়ে চল। অতঃপর তারা রওয়ানা হলো। তারা পরস্পর চুপে চুপে বলে যাচ্ছিল যে, আজ যেন কোন ভিখারী বাগানে তোমাদের কাছে আসতে না পারে। তারা কাউকে কিছু না দেওয়ার ফয়সালা করে খুব ভোরে ভোরে ও তাড়াতাড়ি করে সেখানে এমনভাবে উপস্থিত হলো যেন তারা ফল পাড়ার ব্যাপারে খুব সক্ষম। কিন্তু বাগানটি যখন তারা দেখল তখন বলতে লাগলো ঃ আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গেছি। না, বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খুব উত্তম ছিল সে বলল, আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, তোমরা তসবিহ কর না কেন? তারা উচ্চস্বরে বলে উঠলোঃ মহান পবিত্র আমাদের খোদা। আমরা বাস্তবিকই বড় গুনাহগার ছিলাম। পরে তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তারা বললোঃ আমাদের অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস। আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছিলাম। অসম্ভব নয় যে আমাদের খোদা আমাদেরকে এই থেকেও উত্তম বাগান দান করবেন। আমরা আমাদের খোদার দিকে ফিরে যাচ্ছি। এমনিই হয়ে থাকে আর পরকালের আযাবতো এর চেয়েও অনেক বড়। কতই না ভালো হত যদি এই লোকরা জানত।"

কুরআন মজিদে শুধু একথা বলেই শেষ করা হয়নি যে, মুমিনদেরকে সমাজের মিসকিনদের খাওয়া পরা এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের খেয়াল রাখার দাওয়াত ও তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবার শাস্তির ভয় দেখাতে হবে। বরং কুরআন শরীফ প্রত্যেক মুমিনের উপর মিসকিনের এই অধিকার অর্পণ করেছে যে, সে অন্য মুমিনকেও মিসকিনের খাওয়া পরার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে খেয়াল রাখার উৎসাহ দেবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, মিসকিনের হক পূর্ণ না করা আল্লাহতায়ালার সাথে কুফুরীর সমতুল্য এবং তার ক্রোধও পরকালে জাহান্নামের আযাবের কারণ হবে। এজন্য বাম হাত ওয়ালাদের (অর্থাৎ যাদের বাম হাতে আমলনামা থাকবে) সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা সুরায়ে আল হাক্কাতে বলেছেনঃ "আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবেঃ হায়, আমার আমল নামা আমাকে যদি নাই দেওয়া হত। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি নাই জানতাম। হায় আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত! আজ আমার ধন–সম্পদ আমার

কোন কাজে এল না, আমার সব ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রভূত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে।" (আল-হাক্কাহ ঃ ২৫- ২৯)

এরপর চূড়ান্ত হুকুমদাতা তাদের সম্পর্কে আযাবের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে বলেনঃ "ধর লোকটিকে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর এরপর তাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকল বেঁধে দাও।" অতঃপর আল্লাহতায়ালা এই অটল সিদ্ধান্তের কারণসমূহ উল্লেখ করে বলেনঃ "সে বুজর্গ ব্যক্তি অবশ্যই না আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে আর না সে মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর উৎসাহ দান করত।"

এসব সে আয়াত যা অন্তরকে কাঁপিয়ে দেয় এবং বুকে কম্পন সৃষ্টি করে। এ ধরনের অবস্থাই হজরত আবু দারদার (রাঃ) উপর সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ "হে উম্মেদারদা ! যখন থেকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আগুনের হাড়ি টগবগ করছে। (এই টগবগানো অব্যাহত থাকবে) এমন কি মানুষের ঘাড় তার মধ্যে গিয়ে পড়বে। আল্লাহতায়ালা সেই আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। অতএব, হে উম্মেদারদা ! মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর উৎসাহ দিতে থাক।" কুরআন মজিদ নাজিল হওয়ার পূর্বে এই বিশ্ব এমন কিতাব প্রত্যক্ষ করেনি যাতে ফকির মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর উৎসাহ না দানকারীকে দোযখ এবং কষ্টদায়ক শাস্তির যোগ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সূরায়ে মাউন-এ আল্লাহতায়ালা ইয়াতিমকে দুঃখ দেওয়া এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোতে উৎসাহ না দেওয়াকে দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর ইরশাদ হলোঃ আরাইতাললাজি য়ুকাযযিবু বিদ্বিন ফাযালিকাললাজি ইদুয়য়ুল ইয়াতিমা ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তায়ামিল মিসকিন। (আল-মাউন)।

সুরা আল ফাজরে আল্লাহ তায়ালা জাহেলী যুগের সমাজকে এই শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে সম্বোধন করেছেনঃ কাল্লা বাললা তুকরিমুনাল ইয়াতিমা ওয়ালা তাহাদ্দুনা আলা তায়ামিল মিসকিনা। (আল-ফজরঃ ১৭-১৮) এবং একে "কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না এবং গরীব মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য এরপর উৎসাহিত কর না।" এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা 'তাহাদ্দুনা' (পারস্পারিক উৎসাহ দেওয়া) শব্দ প্রয়োগ করে সমগ্র সমাজকে মিসকিনের দেখাশুনা প্রসঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের আহব্বান জানিয়েছেন। যখন বাম হাতওয়ালা জাহেল এবং দ্বীন ইসলাম মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোতে উৎসাহ দেয় না তখন মুমিন ও দ্বীন ইসলামকে সত্য প্রতিপন্নকারীদের ওপর ফরজ হলো যে, তারা ফকির মিসকিনকে সাহায্য করবে। এতে তাদেরকে অন্যদের (অর্থাৎ যারা সমাজে বেশী ধন সম্পদের অধিকারী) কাছ থেকে সম্পদ নিয়েও

ফকির মিসকিনদেরকে সাহায্য করতে হবে। তা না হলে উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত আযাবে তারা ঘেরাও হয়ে যাবে। এই সাহায্য সমাজ সেবামূলক সংগঠন ও সামষ্টিক সংস্থার মাধ্যমে করা যেতে পারে।

ইবনে হাযমের অভিমত

যে ব্যক্তি কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের কওল ও তাবেয়ীনদের থেকে ফকির মিসকিনদের অধিকারকে পুরোপুরি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন ফকিহ ইবনে হাযম। তাঁর ফিকাহতে বর্ণিত কুরআন হাদীস অথবা আসারে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের দলিল প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। ফকির মিসকিনদের হক বা অধিকার প্রসঙ্গে তিনি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীদের আসার থেকে এমন দলিল পেশ করেছেন যা প্রমাণ হিসেবে সহিহ এবং সংখ্যায়ও অনেক। তিনি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক এলাকার বিত্তশালীদের ওপর যাকাত ছাড়া কিছু অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করতে হবে যা ফকিরদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ঠ হয়। সেই মৌলিক প্রয়োজনাবলী হলো ঃ

১) তার শরীর সুস্থ ও সচল রাখার জন্য যথেষ্ট খাদ্য। ২) সতর ঢাকার জন্য এবং তার শরীর শীত ও গরম থেকে রক্ষার মত পোশাক। ৩) শীত, গরম ও বৃষ্টি থেকে বাঁচার মত বাসস্থান।

কিছু ফকিহ মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, সম্পদে যাকাত ছাড়া কোন ট্যাক্স ইত্যাদি আরোপ জায়েজ নয়। ইমাম ইবনে হাযম এত স্পষ্ট দলিল দিয়ে এই মত খন্ডন করেছেন যাতে কোন ওযর আপত্তির সুযোগ নেই। বস্তুত তিনি নিজের গ্রন্থ "আল-মাহাল্লি'তে লিখেছেনঃ "প্রত্যেক এলাকার বিত্তশালীদের ওপর ফরজ হলো যে তারা সেখানকার ফকিরদের রুটি রুজির দায়িত্ব নেবে। তারা যদি এই দায়িত্ব না নেয় তাহলে সেই সময়কার শাসক তাদেরকে এটা করতে বাধ্য করবেন। যদি যাকাত এবং মুসলমানদের অন্যান্য মাল সাদকা, খয়রাত প্রভৃতি থেকে ফকিরদের প্রয়োজন পূরণ না হয় তাহলে তাদের জন্য সম্পদশালী মুসলমানদের ওপর এত পরিমাণ ট্যাক্স আরোপ করতে হবে যাতে তাদের খোরাক, পোশাক এবং বাসস্থানের জন্য যথেষ্ট হয়।"

কুরআনের দলিল

ইবনে হাযমের (রঃ) উপরিউক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন প্রদত্ত দলিল হলোঃ "আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে দ্বীন ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই সেই

যে ইয়াতিমকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এবং অন্যদেরকে ও মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর উৎসাহ দেয় না।" ওয়াতি যাল কুরবা হাক্কাহু ওয়াল মিসকিনা ওয়াবনাস সাবিল। (আল আসরাঃ ২৬) "আত্মীয়কে তার হক দাও এবং মুসাফিরকে দাও তার হক।" ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানান ওয়া বিযিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসকিনা ওয়াল যারিযিল কুরবা ওয়াল যারিল জুনুবি ওয়াস সাহিবি বিল জানবি ওয়াবনিস সাবিলি ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম। (আন নিসাঃ ৩৬) "পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের প্রতিও। এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথে ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্ত ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর।"

আল্লাহতায়ালা মিসকিন এবং মুসাফিরদের হক আত্মীয়দের হকের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন এবং পিতামাতা, আত্মীয়, স্বজন, মিসকিন, প্রতিবেশী, ক্রীতদাস ও দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার ফরজ করেছেন। ভালো ব্যবহারের দাবী হলো তাদের জীবনের সব প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের জীবনের প্রয়োজনাবলীর প্রতি খেয়াল না রাখা নিঃসন্দেহে খারাব ব্যবহারের শামিল।

নবীর (সঃ) ইরশাদ সমূহ

নবী করিম (সঃ) বিভিন্ন ভাবে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জমিনের ওপর মানুষের প্রতি রহম করেনা আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না। যে ব্যক্তির কাছে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল রয়েছে এবং সে দেখছে যে তার মুসলমান ভাই ভূখা নাঙ্গা রয়েছে ও তাকে সে সাহায্য করছেনা তাহলে সে নিঃসন্দেহে নিজের ভাইয়ের ওপর রহম করেনি।

আবদুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আসহাবে সুফফা ফকির ধরনের মানুষ ছিলেন এবং রাসুলে করিম (সঃ) বলতেন, যে ব্যক্তির কাছে দুই ব্যক্তির খাবার রয়েছে তাহলে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে খাবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলে মকবুল (সঃ) ফরমিয়েছেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করেনা এবং তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়না।" আবু মুহাম্মদ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ালোনা এবং কাপড় পরানোর সামর্থ রাখা সত্ত্বেও নিজের কোন ভাইকে ভূখা–নাঙ্গা থাকতে দেয় সে নিজের ভাইকে অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করলো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমিয়েছেন, "ভূখাকে খাবার খাওয়াও এবং কয়েদীদের মুক্তি দাও।" এই প্রসঙ্গে

কুরআন–হাদীসের দলিল প্রমাণ অনেক বেশী। আসহাবে সাহাবা হযরত আবু আওয়ায়েল শফিক ইবনে মুসলিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ যদি আমি সেই কথা তখন জানতাম যা পরে জেনেছিলাম তাহলে আমি ধনীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে তা মুহাজির ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। হযরত ইবনে আবু তালিব ফরমিয়েছেন, "আল্লাহতায়ালা বিত্তশালীদের সম্পদে ফকিরদের যে হক নির্ধারিত করেছেন তা এত যে তা দিয়ে ফকিরদের প্রয়োজনাবলী পূরণ হয়ে যায়। যদি তা সত্ত্বেও ফকিররা ভূখা–নাঙ্গা থাকে এবং তাদের জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে তার কারণ হলো যে ধনী বা বিত্তশালীরা নিজের সম্পদ থেকে ফকিরের হক আদায় করে না। আল্লাহতায়ালা এই অধিকার রাখেন যে, এ ধরনের ধনীদেরকে কিয়ামতের দিন পাকড়াও করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেনঃ "তোমার সম্পদে যাকাত ছাড়াও এক অধিকার রয়েছে।" হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রাঃ) হাসান ইবনে আলী এবং ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা একজন সায়েলকে বলেছেনঃ "যদি তুমি অতিরিক্ত রক্ত বয়ে যাওয়া, কোমর ভাঙ্গা ঋণ এবং অপমানজনক দারিদ্র্যের কারণে সওয়াল করে থাক তাহলে তোমার হক ওয়াজিব হয়ে যায়। হজরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ এবং অন্য তিনশ' সাহাবা (রাঃ) প্রসঙ্গে সহিহ রেওয়ায়েত আছে যে, তাদের খাদ্য শেষ হয়ে গেলে, আবু ওবায়দা (রাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন নিজের খাদ্যকে দুটি খাদ্য–পাত্রে একত্রিত করেন। যখন তারা একত্রিত করলেন তখন হজরত আবু ওবায়দা তাদেরকে সেই জমা করা খাদ্য থেকে একভাবে খোরাক দিতে লাগলেন। হজরত শায়বী, মুজাহিদ, তাউস প্রমুখদের সম্পর্কে সহিহ রেওয়ায়েত আছে যে তারা বলেছেন, সম্পদে যাকাত ছাড়াও অধিকার রয়েছে। এই বক্তব্যের ওপর সাহাবাদের (রাঃ) ইজমা আছে।

ইবনে হাযম বলেছেনঃ "আমাদের জানা নেই যে সাহাবা এবং তাবেয়ীন প্রমুখদের মধ্য থেকে কেউ এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলেছেন। শুধুমাত্র যাহাক বিন মাযাহিম এর বিরুদ্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যাকাত ফরজ হওয়ার পর সম্পদে অন্য হক মনসুখ হয়ে গেছে।" ইবনে হাযম বলেন, যাহাবের রাওয়াতই দলিলের যোগ্য নয়। তার মত ফিকাহর গ্রহণীয় হতে পারে না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, তাকে দলিল হিসেবে পেশকারী যাহাক নিজেই তার বিরোধী এবং তার মত হিসেবে সম্পদে যাকাত ছাড়া নিম্নের হক সমূহ রয়েছেঃ অভাবগ্রস্ত পিতামাতা, স্ত্রী, ক্রীতদাস এবং জন্তুর ওপর খরচ করা এবং ঋণসমূহ আদায় করা।

৬

ইসলামে সাদকা ও ইহসানের গুরুত্ব

ইসলামে যাকাত প্রভৃতির আইন কানুন ও অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সর্বোপরি ইসলাম দানশীল ব্যক্তির অন্তর এমন এক অন্তরে পরিণত করতে চায়, যে কারোর দাবীর চেয়ে বেশী প্রদান করে এবং যতটুকু পরিমাণ ব্যয় তার ওপর ওয়াযিব তা থেকেও সে বেশী ব্যয় করে বরং না চাইতেই সে দান করে। এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতায় দিনে এবং রাতে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তাই পছন্দ করে। এছাড়াও সে নিজের অস্বচ্ছলতাতেও অন্যাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। সম্পদকেই সে লক্ষ্য হিসেবে মনে করে না বরং লক্ষ্য হাসিলের একটি মাধ্যম মনে করে। সে সম্পদকে মানুষের মঙ্গলের এক মাধ্যম ধারণা করে। তার অন্তর মানুষের মঙ্গলাকাংখায় পরিপূর্ণ থাকে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সওয়াবের নিয়তে দরাজ হাতে খরচ করে। নিজের শান-শওকত ও শোহরত বৃদ্ধি অথবা সমকালীন শাসকের শাস্তির ভয়ে সম্পদ ব্যয় করে না। মানব জীবনের জন্য কতিপয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিই সব বলে যারা ধারণা করে তারা শূন্যে অবস্থান করে থাকে। তারা মানুষের তাৎপর্য সম্পর্কে বেখবর। মানুষ মেশিন নয় যে, ঘুরালেই ঘুরতে থাকবে। কোন চাকাও নয় যে, তাতে নাড়া দিলেই আন্দোলিত হতে থাকবে এবং থামালেই তা থেমে যাবে। মানুষ তো এমন এক জটিল আকৃতির অবয়ব সম্বলিত বস্তু যা অন্তর, শরীর, বুদ্ধি, আবেগ, চিন্তা এবং অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের এমন এক অস্তিত্ব রয়েছে যা চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। সে কিছু জিনিস অনুভব করে এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। সে কিছু জিনিস গ্রহণ করে এবং কতিপয় জিনিসকে অন্যের ওপর অগ্রাধিকার দান করে। কিছু কাজ সে করে এবং কিছু পরিত্যাগ করে। নিজেও সে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্যদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এ জন্য প্রয়োজন হলো মানুষের অস্তিত্বের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখা। তার সমগ্র জীবনের বীণায় ঝংকার সৃষ্টি করা। যাতে আমরা তার চরিত্র ও অন্তরের মাধ্যমে জীবনের অন্য নিয়ম-কানুনের ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হই।

ইসলাম একটি দ্বীন হওয়ার কারণে শুধুমাত্র অধিকারসমূহের প্রতি দৃষ্টি দানই যথেষ্ট মনে করে না। এই সব অধিকার নিয়ম-কানুনের অধীনস্ত এবং তার বাস্তবায়নের

দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তায়। বরং ইসলাম মানব জীবনের নৈতিক দিকের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা জীবনের এইদিক ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যমই নয় বরং নেক কাজ, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বেহেশতে নবীদের বন্ধুত্ব লাভের আকাংখা ও মানুষের প্রশিক্ষণের যে লক্ষ্য ইসলাম হাসিল করতে চায় তার একটি মাধ্যম।

আমরা এখানে কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং নবীর (সঃ) হাদীস বর্ণনা করবো। যাতে সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন, অনুপ্রেরণা ও নিরুৎসাহিত করণ, আল্লাহর পথে খরচের দাওয়াত এবং কৃপণতা ও বখিলী থেকে বাঁচার কথার উল্লেখ রয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে এইসব আয়াত ও হাদীস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যারা এই আয়াত ও হাদীস পাঠ করবেন তাদের অন্তর মোমের মত গলে যাবে এবং সুকৃতির প্রস্রবন বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হবে।

আল্লাহ পাক ফরমিয়েছেনঃ মানজাল্লাজি য়ুকরিদুল্লাহা কারদান হাসানান ফা য়ুদায়িফাহু লাহু আদয়াফান কাছিরান ওয়াল্লাহু ইয়াকবিদ ও ইয়াবসিতু ও ইলাইহি তুরজাউন (আল বাকারাহঃ ২৪৫) "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আল্লাহকে কারজে হাসানা দেবে। যাতে করে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিদান দেবেন। সংকীর্ণ করা এবং প্রশস্ত করা সবই আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

মাছালুল্লাজিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাছালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাবয়া সানাবিলা ফি কুল্লি সামবুলাতিন মিয়াতা হাব্বাতিন ওয়ালালাহু য়ুদায়িফু লিমাইয়াশায়ু ওয়ল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। আল্লাজিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি ছুম্মা লা ইউতবিউনা মা আনফাকু মিনকুম ওয়াআনফাকু লাহুম আজরুন কাবির। "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তার এই ব্যয়ের উদাহরণ এমন যেমন একটি শশ্য দানা বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হয় ও প্রত্যেক ছড়ায় শত দানা হয়ে থাকে। এমনিভাবে আল্লাহতায়ালা যার আমল চান তার প্রশস্ততা দান করেন। তিনি প্রশস্ততাদানকারী এবং সব কিছু জানেন। তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে এবং সম্পদ ব্যয় করবে তাদের জন্য অত্যন্ত বড় প্রতিদান রয়েছে।"

ওয়ায়ুছিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাও কানা বিহিম খাছাছাতুন। ওয়া মাইয়ুকা সুহ্‌হা নাফছিহি ফা উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন (আল হাশরঃ ৯) "এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদেরকে অগ্রধিকার দেয়, নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যে সব লোককে তাদের দিলের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।"

ওয়াআনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম মিন কাবলি .... ফা আচ্ছাদ্দাকা ওয়া আকুন মিনাস সালিহিন। (আল মুনাফিকুন) "এবং ব্যয় কর তা থেকে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু সমুপস্থিত হওয়ার আগেই এই ব্যয় করা উচিত। কেননা মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা আবার বলবে, হে আমার রব কেন তুমি আমাকে সময় দাওনি। সময় পেলে আমি দান খয়রাত করতে পারতাম এবং ভালো লোক হিসেবে পরিগণিত হতাম।"

ফালা আকতাহামাল য়াকরাতা ওয়ামা আদরাক মাল য়াকাবাতু ফাককু রাকাবতিন আও ইতয়ামু ফি ইয়াওমিন জি মাস গাবাতিন। ইয়াতিমা জা মাকরাবাতিন। আও মিসকিনান জা মাতরাবাতিন ছুম্মা কানা মিনাল্লাজিনা আমানু ওয়া তাওাছাও বিসসাবরি ও তাওয়াছাও বিল মারহামাতি। উলায়িকা আসহাবুল মাইমানাহ। (আল বালাদঃ ১১–১৮) "কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাটিপথ অতিক্রম করার সাহস করে নাই। তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ কি? কোন গলা দাসত্ব শৃংখল হতে মুক্ত করা কিম্বা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতিম বা ধুলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। আর (সেই সাথে) শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। এই লোকেরাই দক্ষিণপন্থী।"

আল্লাজিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম বিল্লাইলি ওয়ান্নাহারি সিররান ওয়া আলানিয়া তান ফালাকুম আজরুহুম ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানূন। (আল বাকারহঃ ২৭৪) "যারা নিজেদের ধন–মাল রাত দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের খোদার কাছেই প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।"

ওয়া সারিয়ু ইলা মাগফিরাতিন মির রাব্বিকুম ওয়াজান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদু উয়িদদাত লিল মুত্তাকিন। (আল এমরানঃ ১২২–১২৪) "সেই পথে তীর গতিতে চল, যা তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা সেই খোদাভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

কুল ইন্না রাব্বি ইয়াবসুতুর রিযকা লিমানইয়াশায়ু মিন ইবাদিহী ওয়া ইয়াকদিরু লাহু। ওয়ামা আনফাকতুম মিন শাইয়িন ফাহুয়া য়ুখলিফুহু ওয়াহুয়া খাইরুর রাযিকিন। "হে নবী, তাদের বলো। আমার রব নিজের বান্দাহর মধ্য থেকে যাকে চান ব্যাপক রিযিক দিয়ে থাকেন এবং যাকে চান কম দেন। যা কিছু তোমরা ব্যয় করে থাক সেই স্থানে তিনি আরো দিয়ে থাকেন। তিনি রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।"

ওয়া ইউতয়িমুনাত তায়ামা আলা হুববিহি মিসকিনান ওয়া ইয়াতিমান ওয়া আসিরা। ইন্নামা নুতরিমুকুম লি ওয়াজহিল্লাহি লা নুরিদু মিনকুম জাযায়ান ওয়ালা শাকুরা। ইন্না নাখাফু মিররাব্বিনা ইয়াওমান আবুসান কামতারিরা। (দাহারঃ ৮–১০)। "এবং আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, ইয়াতিম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। আর তাদেরকে বলে আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে না কোন প্রতিদান চাই, না কৃতজ্ঞতা। আমরা তো খোদার প্রতি সেইদিনের আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত যে দিনটি কঠিন বিপদের এবং অতিশয় দীর্ঘদিনের হবে।"

নবীর হাদীস সমূহ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "বান্দাহ বলে থাকে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। তার সম্পদ তো শুধু তাই যা সে খেয়ে ফেলে এবং শেষ হয়ে যায়। যা সে পরিধান করে এবং ছিঁড়ে যায়। আর যা সে আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়। এ ছাড়া তার কাছে আর যা থাকে তা সে অন্যান্যদের জন্য রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। (" মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে,যে নিজের উত্তরাধিকারদের মালকে নিজের মাল থেকে বেশী ভালবাসে?" সাহাবারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সে নিজের মালকে বেশী ভালোবাসে না।" তিনি বললেন, "অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের সেই সম্পদই আসল সম্পদ যা তোমরা খোদার রাস্তায় খরচ করে আল্লাহর নিকট সঞ্চয় গড়ে তোল এবং উত্তরাধিকারদের সম্পদ তো সেই সম্পদ যা তোমরা পেছনে রেখে যাও।" (নাসায়ী)

আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে এমনভাবে সরাসরি কথা বলবেন যে তিনি এবং তার মধ্যে কোন ভাষ্যকার থাকবে না। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিজের ডানদিকে নজর করে তাই দেখতে পাবে যা সে আগে প্রেরণ করেছিল। বামদিকে ফিরেও তাই দেখতে পাবে। সামনে তাকিয়ে শুধু আগুন আর-আগুনই দৃশ্যমান হবে। অতএব, আগুন থেকে বেঁচে থাক। একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা দিয়ে হলেও এই আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি নিজের হালাল কামাই থেকে এক খেজুর সমান সাদকা করে এবং শুধুমাত্র হালাল কামাইই গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহতায়ালা তার সেই দান অত্যন্ত

ইহসানের সাথে কবুল করেন। অতঃপর তা সাদকা প্রদানকারীর উপকারের জন্য প্রতিপালন (বৃদ্ধি করতে) করতে থাকেন। যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের বাছুর প্রতিপালন করে। অবশেষে সেই সামান্য পরিমাণ সাদকা এক পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম) হজরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমিয়েছেন, "সাদকা গুণাহকে এমন করে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে।" (আবু ইয়ায়লা)

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এক দিরহাম এক লাখ দিরহাম থেকেও বেড়ে গেছে।" এক ব্যক্তি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল তা কেমন করে?" তিনি বললেন, "একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে এক লাখ দিরহাম নিল এবং সাদকা করে দিল। অন্য এক ব্যক্তি যার কাছে মাত্র দু দিরহাম রয়েছে। সে এই দুই দিরহাম থেকে এক দিরহামই দান করে দিল। অল্প বিত্তের এই এক দিরহাম ধনাঢ্য ব্যক্তির একলাখ দিরহামের চেয়ে আল্লাহর নিকট সওয়াবের হিসাবে বেশী বলে পরিগণিত হবে।" (নাসায়ী, ইবনে খাজিমাহ, ইবনে হাববান, হাকেম)

উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমিয়েছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাদকার ছায়ায় থাকবে। এমনকি মানুষের মধ্যে বেহেশত ও দোজখের ফয়সালা করে দেয়া হবে।" (আহমদ, ইবনে খাজিমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও নবীর হাদীসসমূহ মুসলমানদের বাস্তব জীবনের ধারা পরিবর্তনে কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয় এমনটি চিন্তা করার কোন কারণ নেই। বরং এই সকল আয়াত ও হাদীস মানুষের পবিত্রতর অনুভূতি, সুন্দর আবেগ, ভালো আকাংখা এবং নেক কাজে অংশগ্রহণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মশালের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এই কথার সমর্থনে ইসলামের ইতিহাস থেকে কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হলো।

মুফাস্সিররা হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রাঃ) বলেছেন, যখন মানজাল্লাজি য়ুকরিদুল্লাহা কারাদান হাসানান ফায়ুদায়িফুহু লাহু (এমনও কি কেউ আছে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা দেবে এবং আল্লাহ তা বাড়িয়ে প্রতিদান দেবেন) এই আয়াত নাজিল হলো তখন হজরত আবু দাহাদ্দাহ আনসারী (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ কি আমাদের কাছ থেকে করজ চান?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "হাঁ আবু দাহাদ্দাহ!" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনার হাতটা দিন।" অতঃপর রাসূলের (সঃ) পবিত্র হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "হুজুর, আমি আমার বাগানটি আল্লাহতায়ালাকে করজ দিলাম।" ইবনে

মাসউদ বলেছেন, আবু দাহাদ্‌দা'হর বাগানে একশত খেজুর গাছ ছিল এবং তার পরিবার পরিজনও সেখানেই থাকতেন। তিনি সে সময় সোজা বাগানে আসলেন এবং ডেকে বললেন, "হে দাহাদ্‌দা'হর মা!" সে জবাব দিল "লাব্বাইক।" আবু দাহাদ্‌দাহ বললেন, "সন্তানদের নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে আস।" (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি)

ইমাম আহমদ (রঃ) হজরত আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধনী ছিলেন হজরত আবু তালহা (রাঃ)। তিনি তাঁর সমস্ত ধন সম্পদের মধ্যে "বিররা" নামক বাগানকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। আর এই বাগানটি ছিল মসজিদে নববীর পাশে। নবী করিম (সঃ)ও প্রায়ই এই বাগানে যেতেন এবং কূপের উত্তম মিষ্টি পানি পান করতেন। যখন "লানতানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের পছন্দনীয় জিনিস খোদার রাস্তায় ব্যয় করবে না, কক্ষনই ভালাই পাবে না) এই আয়াত নাযিল হলো, তখন হজরত আবু তালহা (রাঃ) উপস্থিত হয়ে রাসূলের (সঃ) নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তায়ালা ফরমাচ্ছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের পসন্দনীয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে না কক্ষণই তোমরা মঙ্গল পাবে না। আর আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় সম্পদ হলো 'বিররা' নামক বাগানটি। অতএব, আমি আল্লাহর নিকট মঙ্গল জমা রাখার আশায় আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম। এখন হে আল্লাহর রাসুল ! আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তা বন্টন করতে পারেন। তিনি খুশী হয়ে বলতে লাগলেন, "বাহবা! এতো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এতে মানুষের অনেক উপকার হবে!" এর পরে বললেন, "আমার মত হলো, তুমি এই বাগান নিজের আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও।" হজরত আবু তালহা (রাঃ) আরজ করলেন, "খুব ভালো কথা।" অতঃপর নিজের আত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর (আল্লাহর পথে ব্যয়ের) এই ধারা প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অব্যাহত রয়েছে। জনগণ ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই তার উচ্চ এবং অনেক উত্তম নিদর্শন অবলোকন করেছে। তারা প্রত্যক্ষভাবেই দেখেছে যে, মুসলমানের নিকট আল্লাহ এবং তার রাসুল ও উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের পুঞ্জীভূত সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বস্তু জগতের প্রত্যেকটি সম্পদ কত তুচ্ছ। ইমাম লাইস (রঃ) বিন সায়াদ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তাঁর প্রতিদিন আয় ছিল প্রায় এক হাজার দিনার। এ সত্ত্বেও তাঁর ওপর যাকাত ওয়াজিব হতো না কেননা তিনি সম্পদ এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মত সময় নিজের কাছে রাখতেন না। বরং যে সম্পদ তাঁর কাছে আসতো তিনি তা সাদকা করে দিতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়

করে ফেলতেন। কথিত আছে যে, ইমাম লাইস প্রত্যেক দিন ৩৬০ জন মিসকিনকে সাদকা প্রদান ছাড়া কথাই বলতেন না। এও কথিত আছে যে, একবার জনৈক মহিলা তাঁর নিকট কিছু মধু চাইলো। তিনি তাকে এক পাত্র মধু দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বলা হলো, মহিলাতো এর থেকে কম মধুতেই রাজী হতো। জবাবে তিনি বললেন, "সে তার প্রয়োজন মাফিক চেয়েছে। আল্লাহ পাক আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সেই মুতাবিক আমি তাকে দিয়েছি।"

এভাবে আব্দুল্লা বিন জাফর সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি কোন অভাবগ্রস্ত সায়েলকে নিজের দরজা থেকে কখনো খালি হাতে ফেরত দেননি। তাঁর এক সহযোগী এই ভূমিকা গ্রহণের জন্য গাল-মন্দ দিলেন। তিনি উত্তরে বললেন, " আল্লাহ আমাকে এক অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছেন। আমিও তাঁর বান্দাহকে এক অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছি। আল্লাহ পাক আমাকে ধন সম্পদ দেন আর আমি তা তাঁর বান্দাহদেরকে দান করার অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছি। এখন ভয় হয়। আমি যদি আমার অভ্যাস পরিত্যাগ করি তাহলে আল্লাহও হয়ত তাঁর নিয়ম পরিত্যাগ করবেন।"

দানমূলক ওয়াকফ

সাদকাসমূহের মধ্যে ইসলাম সাদকায়ে জারিয়াকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। অন্যান্য সাদকার প্রতিদান ও সওয়াবের তুলনায় সাদকায়ে জারিয়ার প্রতিদান ভিন্নধর্মী মর্যাদার অধিকারী। কেননা সাদকায়ে জারিয়ার প্রভাব ও ফলে এক ধরনের স্থায়িত্ব পাওয়া যায়। এজন্য তার সওয়াব সাদকাকারীর মৃত্যুর পরেও সেই সময় পর্যন্ত পৌছাতে থাকে যতক্ষণ মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেনঃ "যখন মানুষের হায়াতের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় তখন সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং দোয়া খায়েরকারী সুসন্তানের দোয়া ছাড়া সকল কাজই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) খায়বারের কিছু জমি পেলেন। তিনি নবী করিমের (সঃ) খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! খায়বারের জমির অংশটুকুই আমার সবচেয়ে বেশী উত্তম এবং প্রিয় সম্পদ, (আমি তা আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিতে চাই) বলুন আমি কি করবো!" তিনি বললেন, "আসলকে (জমি) নিজের কবজায় রাখো এবং তা থেকে উৎপাদিত ফল প্রভৃতি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ কর।" বস্তুতঃ হযরত ওমর (রাঃ) ফকির, আত্মীয়-স্বজন, কয়েদী, অক্ষম এবং মুসাফিরদের জন্য জমির উৎপাদিত ফল ইত্যাদি এই শর্তে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন যে, তা বিক্রয়, হেবা অথবা

উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে প্রদান করা যাবে না অবশ্য যাকে এই ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হবে সে যদি সুষ্ঠুভাবে তা থেকে কিছু নিয়ে খেয়ে ফেলে এবং তা নিজের সম্পদ না বানায় তাহলে তার জন্য গুণাহ হবে না।

রাসূলে খোদা (সঃ) হজরত ওমরকে উৎপাদিত দ্রব্য ইত্যাদি খোদার রাস্তায় ওয়াকফ করার নির্দেশ দিয়ে দানমূলক ওয়াকফের জন্য এক শরয়ী ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছেন। এই ভিত্তি প্রত্যেক যুগের মুসলিম সমাজে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া এটা মুসলমানদের অন্তরে নেক কাজ করার আবেগ জাগ্রত করার এক আলোকময় উদাহরণ ও দলিল হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। আর সে কারণেই মুসলিম সমাজে প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যার জন্য সমাজের বিত্তশালীরা নিজের সম্পদের একটি অংশ ওয়াকফ করেননি।

এই ধরনের ওয়াকফ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী ব্যবস্থায় এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ফকির এবং অক্ষমদের জন্য মুহতাজখানা কায়েম করা হয়েছে। এই মুহতাজখানা থেকে তাদের খাদ্য এবং বস্ত্রের প্রয়োজন মিটানো হতো। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হতো। ফকির ও অভাবগ্রস্তদের এই সকল চিকিৎসালয় থেকে চিকিৎসা করা হয়েছে। এ ছাড়া তাদের জন্য সফর ইত্যাদিরও সুযোগ করে দেয়া হতো।

মুসলমানরা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতো যে, সমাজের কোন কোন এমন প্রয়োজন আছে যাতে ব্যয় করা যায়। অতঃপর তারা এজন্য নিজের সম্পদের কিছু অংশ ওয়াকফ করে দিতেন। এমনকি তারা অসুস্থ পশুর চিকিৎসা ও মালিকহীন কুকুরের খাদ্য প্রভৃতির জন্যও আওকাফ কায়েম করেন। নির্বাক পশুর জন্য যদি মুসলমানদের অন্তর এই ধরনের রহম দিল হয়ে থাকে তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জন্য তাদের ধ্যান–ধারণা কি ধরনের ছিল!

যদি মুসলিম সমাজে এতিম, অভাবগ্রস্ত, অন্ধ, অক্ষম এবং অন্যান্য মজবুর ও মুসিবতজাদাহ ব্যক্তির জন্য ওয়াকফের এক অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা এখানে মিসরের জনৈক শাসকের এক ঐতিহাসিক দলিলের বিবরণী পেশ করছি। এই দলিলটি হলো "কালাদুনের" দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওয়াকফনামা। ওয়াকফ্নামাটি একটি সরকারী দলিল। এই দলিলে ওয়াকফকারী নিজের ওয়াকফ সম্পর্কে প্রত্যেক জিনিস লিপিবদ্ধ এবং তার সীমা নির্ধারণ করেন। মুসলমানদের মধ্যেকার কোন আদিল এবং নেককারকে তার সাক্ষী বানানো হয়। যাতে যার তত্ত্বাবধানে ওয়াকফ সম্পত্তি চলবে সে তার পূর্ণ ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে পারেন। ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ককে "নাজের" নামে অভিহিত করা হয়। উল্লিখিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওয়াকফনামায় লিপিবদ্ধ আছেঃ

"এই চিকিৎসালয় মুসলমান নারী-পুরুষের চিকিৎসার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। স্বচ্ছল ও বিত্তশালী হোক অথবা সে ফকির অথবা অভাবগ্রস্ত হোক, কায়রো অথবা তার উপকণ্ঠের বাসিন্দা হোক, অথবা বাহির থেকে আগত হোক, নারী-পুরুষ এবং ভিন্ন ধরনের রোগ নির্বিশেষে সবাই এক সাথে অথবা পৃথকভাবে বার্ধক্য ও যৌবনকালে এই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে। নারী-পুরুষ, ফকীর ও অভাবগ্রস্ত রোগীরা নিজেদের পূর্ণ সুস্থতা ফিরে আসা এবং চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে অবস্থান করবে। হাসপাতালে চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য যা কিছু সরবরাহ করা হবে তা স্থানীয় ও মুসাফির নির্বিশেষে সবার ওপরে শর্তহীনভাবে ব্যয় করা হবে। এবং নাজের এই ওয়াকফের আয় থেকে রোগীদের প্রত্যেক প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। যেমন বিছানা, লেপ ও তোষক ইত্যাদি। প্রত্যেক রোগীর জন্য তার রোগ এবং অবস্থা অনুযায়ী চার পায়া এবং বিছানা সরবরাহ করবেন। সকল রোগীর অধিকার আদায়ে খোদাভীতি এবং তার আনুগত্যকে সামনে রাখতে হবে এবং তাদেরকে নিজের প্রজা মনে করে তাদের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা প্রত্যেক শাসককে নিজের প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গোশত এবং অন্যান্য দ্রব্য রান্নার ব্যবস্থা হাসপাতালের বাবুর্চি করবেন। প্রত্যেক রোগীর জন্য যা কিছু রান্না করা হবে তা তার জন্য এক বিশেষ কক্ষে ঢেকে রাখা হবে। অন্য রোগী তা থেকে কিছু নিতে পারবে না। যখন সকল রোগীর জন্য খানা তৈরী হবে তখন প্রত্যেক রোগীকে তার নিজের খাবার দেওয়া হবে। রাত এবং দিনের যে খাবার ডাক্তার সাহেব তাদের জন্য প্রস্তাব করবেন তা তাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। নাজের এই ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে মুসলমান ডাক্তারদের বেতন ইত্যাদি দেবেন। এই সকল ডাক্তার এক সাথে অথবা পালাক্রমে রোগীদের সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব পালন করবেন। খানা-পিনার যেসব বস্তু রোগীর জন্য ঠিক হবে তা তারা ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন এবং সামষ্টিকভাবে পালাক্রমে প্রত্যেক রাতে তারা হাসপাতালে থাকবেন ও রোগীদের চিকিৎসা এবং দেখাশুনা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে অসুস্থ হয় এবং সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে নাজের হাসপাতাল থেকে শরবত, ওষুধ এবং পথ্য, যা তার জন্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে পারবেন। তিনি এ ব্যাপারে খরচের প্রশ্নে কোন ধরনের কৃপণতা করবেন না।"

এই ঐতিহাসিক দলিল সেই যুগের যে যুগ মুসলমান এবং ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগের মোকাবিলায় নিম্নমানের যুগ হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতি সাফল্যের কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

ইসলামী অর্থনীতি তখনই শুধুমাত্র কাংখিত ফল দিতে পারে যখন এমন এক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা এবং শরয়ী বিধান জীবনের অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়। যদি এ কথা বলা হয় যে, ইসলাম সেই সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে যে সমাজে অন্যান্যদের জীবন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। এই জীবন ব্যবস্থার কিছু প্রাচ্য এবং কিছু পাশ্চাত [illegible] আমদানি করা হয়েছে এবং তাতে ইসলামী ব্যবস্থার কিছু অংশ জুড়ে দেয়া [illegible] করে[illegible] তাহলে তা হবে ইনসাফ বিরোধী এবং অযৌক্তিক কথা। দারিদ্র্য দূরীকরণে [illegible]থম হাতিয়ার হলো কাজ। মানুষের জন্য আবশ্যক হলো সে কোন না কোন ক[illegible] করবে এবং কাজের মাধ্যমে সে স্বাবলম্বী হবে। কিন্তু কাজ দিয়ে কি সে কাংখিত ফল লাভ করতে পারে? যদি মানুষ এমন এক কাজ করে যা সে ভালোভাবে করতে পারে না। অথবা যদি সে ভালোভাবে করতেও পারে তাহলে তার পরিশ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পায়। আবার পারিশ্রমিক পুরোপুরি পেলেও এমন সুযোগ সে পায় না যা দিয়ে সে নিজের যোগ্যতা এবং সৃষ্টিধর্মীতার বিকাশ ঘটিয়ে উন্নতি করতে পারে। হতে পারে সে পরিশ্রমও করে এবং নিজের যোগ্যতার মাধ্যমে কাজ করে নব আবিস্কারের হকও আদায় করে। কিন্তু নিজের পরিশ্রম এবং ভালো কাজ অনুযায়ী বিনিময় পায়না ও তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় না। বরং তাকে প্রতিশোধ স্বরূপ শত্রুতা করে নিজের বৈধ অবস্থান থেকেও নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধুমাত্র পক্ষপাতিত্ব অথবা স্বেচ্ছাচারিতা করে অযোগ্য লোককে তার ওপরে বসিয়ে দেয়া হয়। এও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের কাজের যথাযথ পারিশ্রমিকও পায় কিন্তু যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজের জীবনাচরণের নিয়মই হলো তার আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয়ে বাধ্য করে। আর এই বেশী ব্যয়ে তার নিজের বা সমাজের কোন কল্যাণ নেই। এ কথা বলার অর্থ হলো আরাম-আয়েশ, নিম্নমানের আনন্দ ফুর্তি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সিগারেট, সিনেমা, থিয়েটার, নাচ, গান ইত্যাদির মত সমাবেশে হারাম ও অনাকাংখিতভাবে এত ব্যয় হয়ে যায় যে তাতে ব্যক্তি এবং তার পরিবার পরিজনের প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য

নামমাত্রই কিছু অবশিষ্ট থাকে। এও হতে পারে যে, সে গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট নয় কিন্তু যে সমাজে সে বাস করছে তাতে একচেটিয়া সুদ এবং শোষণের রাজত্ব চলে। জুলুম, নির্যাতন এবং ফিতনা ফাসাদের তান্ডব বহানো হয়। সে যে জিনিসই ক্রয় করুক না কেন তা কালোবাজারে কিনতে হয়। ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করাতে পারে না। এবং তার যদি ঋণের প্রয়োজন হয় তাহলে সুদ ছাড়া কোথায়ও তা পায় না। যখন সে জীবন অথবা সম্পদের দিক থেকে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং শক্তি থাকতেও কাজ করতে অক্ষম হয় অথবা তার সেই মূলধন নষ্ট হতে থাকে যা দিয়ে সে হালাল রুজি কামাই করতে পারে। অতঃপর সে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং ঋণগ্রস্ত হিসেবে পরিচিত হতে থাকে, তাহলে সে কি করবে ও সমাজ তার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবে। এই সকল বাস্তবতার আলোকে বিশ্বাস ও আস্থার সাথে বলা যায় যে, অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রম করে স্বচ্ছল জীবনের কোন গ্যারান্টি পেতে পারে না। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রম এবং শ্রমকারীর অবস্থাই অন্য ধরনের হবে। এই ইসলামী সমাজের বাগডোর থাকবে একটি ইসলামী সরকারের হাতে।

১- ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের কাজের ব্যবস্থা এবং কাজে নিয়ো[illegible] ব্যক্তিদের নিজস্ব পেশায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আবশ্যিকভাবে করবে। যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২- ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক পেশায় নিয়োজিত কারিগরকে তার নির্দিষ্ট ময়দানে রাখবে যাতে উত্তম ফল লাভ করা যায়।

৩- প্রত্যেক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সে হাতিয়ার সরবরাহ করবে যাতে সে কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে বেশী বেশী উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে।

৪- ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার পরিশ্রম ও প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিকের গ্যারান্টি দেবে। এই পারিশ্রমিক যতই হোক না কেন। এমনিভাবে প্রত্যেক কারিগরকে নিজের তৈরী বস্তুতে মালিকানার অধিকারের সুযোগ দেওয়া হবে এবং তার পরে সে নিজের সন্তানদেরকে তাতে উত্তরাধিকার বানাতে পারবে।

৫- যখন কোন শ্রমিক নিজের পারিশ্রমিক অথবা লাভ দিয়ে নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না তখন তার প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব বাইতুলমালের ওপর ন্যস্ত হবে।

৬- যদি সে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয় তাহলে তাকে ঋণগ্রস্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং সে যাকাতের মালের হকদার হবে।

৭- এই সকল নিয়ম শুধুমাত্র তখনই হতে পারে যখন সঠিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে। যে সমাজে মদ, ব্যভিচার, ফজুল পোশাক, ফাসাদ ও বিপর্যয়

সৃষ্টির কোন সুযোগ নাই। কেননা এই সকল জিনিসে মানব জাতি ধ্বংস হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি ও সমাজ সুস্থ ও সঠিক জীবনের প্রয়োজনাবলীর মোকাবিলায় অত্যন্ত দুঃখ–কষ্টে নিপতিত হয়।

আজকের মুসলিম সমাজে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

ধরুন আজকের কোন সমাজে যারা নিজেকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে তারা যদি যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় তাহলে ফল কি দাঁড়াবে ? আমার মতে তাতে নিম্নে বর্ণিত ফল দাঁড়াবেঃ

১– এমন পরিমাণ যাকাত জমা হবে যা দারিদ্র মোকাবিলায় যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। এই অল্প পরিমাণ জমা হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যার মধ্যে দুটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলোঃ

প্রথমতঃ মানুষ সরকারকে যাকাত আদায় করতে দ্বিধা করবে। কেননা সরকার আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের অসহনীয় কর ধার্য করে রেখেছেন। আর যে সরকার যাকাত জমা [illegible]েন অথচ কিতাব ও সুন্নাহর ওপর আমলের ব্যবস্থা করবেন না সেই সরকারের ওপর জনগণের কোন আস্থাই থাকতে পারে না। অধিকন্তু জনগণ এ ধারণা করবে যে যাকাতের অর্থ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কাজে ব্যয় না হয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যয় করা হবে। যেমন অন্যান্য করের ব্যাপারে করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত মুসলিম সমাজের অধিকাংশেরই সম্পদ এবং আয় নেই। বর্তমান যুগের জীবন ব্যবস্থা মেনে চলারই এটা প্রভাব। জীবন ব্যবস্থাও এমন [illegible] বিদেশী কাফেরদের জীবন ব্যবস্থা। অথচ মুসলমানরা তার অন্ধ অনুকরণ করে চলে[illegible] এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে আঙ্গুল প্রবেশ করায় তাহলে মুসলমানরাও তাই ক[illegible]। তাদের জীবন ব্যবস্থা আরাম–আয়েশ, প্রকাশ্য টিপ টপ, অবৈধ ও নিষিদ্ধ খেলাধু[illegible] অতিরিক্ত খরচ এবং অপচয়ের ভিত্তির ওপর দন্ডায়মান।

২– যাকাতের সেই সামান্য পরিমাণেরও একটি অংশ প্রশাসনিক জটিলতা এবং প্রকাশ্য ঠাঁট–বাট ও প্রদর্শনীর দিকে নজর দানের কারণে, যাকাত দফতরের আসবাবপত্র ক্রয় এবং যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য নিয়োগকৃত কর্মচারীদের পেছনেই খরচ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যাকাত ফকির–মিসকিনদের কাছে পৌছার পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে।

৩– কেননা সরকার এবং জনগণকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং তাদের দিল ও অন্তরকে মুসলমান বানানো হয়নি। এ জন্যে যাকাত

বন্টনের সময় গড়বড় এবং কারচুপি হবেই। এর ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ যাকাতের হকদার যাকাত থেকে বঞ্চিত হবেন এবং যারা হকদার নয় তারা তা নিয়ে যাবে।

৪– অবশেষে এই কারণে শুধু যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সব ফকির মিসকিনদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ হবে না। বরং তাদের মধ্যে শুধু কতিপয় তারাই যাকাত থেকে উপকৃত হবে যারা তা বন্টনের সময় কিছু পরিমাণ পাবে। এরপর যাকাত ব্যবস্থা সম্পর্কেই সাধারণ মানুষ অভিযোগ উত্থাপন করে তার অপকারিতা বর্ণনা করতে থাকবে। আর এমনিভাবে ইসলামের পুরো জীবনব্যবস্থা সম্পর্কেই শোবাহ সন্দেহের রাস্তা খুলে যাবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, ইসলামের হুকুম–আহকাম এবং শিক্ষার সাথে বর্তমান যুগের কোন অনৈসলামী ব্যবস্থার জোড়াতালি দেওয়ায় কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না এবং কোন নৈতিক রোগের চিকিৎসাও করা যায় না।

আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তখনই হতে পারে যখন আমরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে এককভাবে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবো। ইসলাম ব্যক্তির অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তির কাজ এবং নিজের উদ্ভাবনী শক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে উপকৃত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ব্যক্তি মালিকানাকে বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বরং কতিপয় সীমা–পরিসীমা নির্ধারণ করে তা হেফাজত করে। যাতে সমাজে জুলুম, নির্যাতন, সীমা লংঘন ও বিদ্রোহের তান্ডব বইতে না পারে। ইসলাম ব্যক্তির জন্য উত্তরাধিকারের অধিকার নির্ধারণ করে। তাতে সে নিজের পরবর্তীকালে নিজের সন্তান–সন্ততির প্রশ্নে নিশ্চিত থাকতে পারে। এমনিতেই ইসলাম ব্যক্তির জন্য উন্নয়নের ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের সুযোগ করে দেয়। যাতে সে নিজের যোগ্যতার প্রকাশ ঘটিয়ে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। তা দিয়ে অন্যদেরকেও উপকৃত করতে পারে[illegible] সলামে একজন নেককার মানুষের জন্য সম্পদ হলো সংশোধন ও সংস্কারের মাধ[illegible] সলাম এসব কিছু এ জন্যে করে যে, সমগ্র মুসলিম সোসাইটির সামষ্টিক সম্পদে[illegible]ন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন হয়। আর তা সমাজের প্রত্যেক মানুষকে উপকৃত করে। ইস[illegible] ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানার অধিকার, কোন কাজ করা এবং নিজের উদ্ভাবনী শক্তি[illegible] উন্মেষ ঘটানোর স্বাধীনতা দান করার সময় পুঁজিবাদ ভিত্তিক ব্যবস্থার মত সমাজের কল্যাণ এবং মুসলিহাতকে উপেক্ষা করে না। বরং ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে এক ইনসাফভিত্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই নিজের অধিকারপ্রাপ্ত হয় এবং কম–বেশী তারা নিজের ফরজ বা দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইসলামী ব্যবস্থায় ধন–সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ পাক। বাহ্যিক দিক থেকে যিনি সম্পদের মালিক হন প্রকৃতপক্ষে তিনি সম্পদের আমানতদার মাত্র। এই সম্পদ অপচয়ে তার কোন অধিকার নেই। বরং সে তা খরচের সময় সম্পদের প্রকৃত

মালিকের হুকুম–আহকাম এবং হেদায়াত মানতে বাধ্য। তিনি সেই মালিক যিনি ধনী–গরীব নির্বিশেষে সবারই পালনকর্তা। তিনি একজন মাতার নিজের শিশুর প্রতি যেমন দয়ালু তার চেয়েও বেশী মেহেরবান। এ জন্যে মানুষের পালনকর্তা সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবহার, বন্টন ও ব্যয়ের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। আর এই ব্যবস্থাতেই সমাজের সকল ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র জাতির ধনী–গরীব নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় সম্পদ নষ্ট এবং অপচয় করা প্রতিহত করা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয় এই ব্যবস্থায় হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং আইন করা হয়েছে যে, কোন নাদান, অতিরিক্ত খরচকারী ও সম্পদ বিনষ্টকারীর জিম্মায় কোন সম্পদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ লাতু'তুস্ সুফাহাউ আমওয়ালাকুমুল্লাতি জায়াল্লাহু লাকুম কিয়ামান (আন নিসা)। "যে সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন যাপনের মাধ্যম বানিয়েছেন তা নাদান লোকদের হাওয়ালা করো না।"

এই ব্যবস্থা এমন আরাম আয়েশের জীবনের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা জাতিসমূহের সংখ্যালঘু মানুষের শান–শওকতপূর্ণ জীবন বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে বিদ্বেষের অনল জ্বালিয়ে দেয়। এই ধরনের আরাম–আয়েশে জীবন অতিবাহিতকারীরা হেদায়াত লাভ করতে পারে না। তাদের ব্যাপারটি ঠিক এমন যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ ইন্না বিমা উরসিলতুম বিহি কাফিরুন (হেদায়াত এবং কল্যাণের যে পয়গাম এবং কর্মসূচী তুমি নিয়ে এসেছ, তার আমরা অস্বীকারকারী) তাদের এই আরাম আয়েশ সমগ্র জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহপাক ফরমিয়েছেনঃ ওয়া ইজা আরাদনা আন নুহলিকা আরইয়াতান আমরানা মুতরাফিহা ফাফাসুক ফিহা ফাহাককা আলাইহাল আওলু ফাদাম্মারনাহা তাদমিরা (আসরাঃ১৬) "যখন আমরা কোন বস্তিকে হালাক করার ইচ্ছা করি তখন সেই বস্তির স্বচ্ছল লোকদের নির্দেশ দিই এবং তারা সেখানে নাফরমানি করতে থাকে। তখন শাস্তির সিদ্ধান্ত সেখানে আপতিত হয় এবং আমরা তা ধ্বংস করে ছাড়ি।" আরাম আয়েশের জীবন থেকে বিরত রাখার এই নীতির অধীন ইসলাম সোনা রুপার বাসনপত্র এবং এই ধরনের জিনিসপত্র রাখা হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এইসব জিনিস তাকাব্বারকারী মানুষের গৃহে আরামপূজার নিদর্শন হিসেবে স্থান পায়। এভাবে পুরুষের জন্য সোনা ও রেশমের কাপড় ব্যবহারও ইসলামে হারাম। ইসলামী ব্যবস্থায় খাদ্য মওজুদকরণ এবং সুদও হারাম। কেননা পুঁজিবাদের অস্তিত্ব এই দুই অপয়া ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান থাকে। এই প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমদের হাদীসের উল্লেখ করা যায়। নবী করিম (সঃ) ফরমিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য শুধুমাত্র মুনাফার লোভে মওজুদ

করে সে আল্লাহর কাছে নিজের অসন্তুষ্টি এবং আল্লাহ তার প্রতি নিজের অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করে দেন।

কুরআন মজিদে স্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান যে, সুদখোর যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর যদি সে তওবা করে তাহলে সে শুধু নিজের আসল সম্পদই পাবে। সে অন্যের ওপর জুলুম করবে না। এবং তার উপরও জুলুম করা হবে না। মওজুদদারী এবং সুদের নিঃসন্দেহ অর্থ হলো যে, সমাজের বিত্তশালীরা গরীব এবং অসহায়দের রক্ত শুষে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে ধনী ধনীই হতে থাকে আর গরীব গরীবই হয়ে যায়। ইসলাম অর্থকড়ি জমা করা ও তা বেকার পড়ে থাকারও কঠোর সমালোচনা করেছে। এবং প্রত্যেক ধরনের নগদ সম্পদ নিসাব পর্যন্ত পৌছলেই যাকাত ফরজ করে। এই সম্পদের মালিক তা থেকে উপকৃত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এই নিয়মে বিত্তশালীদের বাধ্য করা হয়েছে, সে প্রত্যেক বৈধ কারবার এবং ব্যবসায়ে নিজের পুঁজি নিয়োগ করবে। বছর অন্তর যাকাত দিতে দিতেই তাঁর পুঁজি যেন নিঃশেষ না হয়ে যায়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের পারস্পরিক লেনদেনে ন্যায় ও ইনসাফের দাবী পূরণ করা ফরজ। ইসলাম মালিক এবং শ্রমিক, ক্রেতা, বিক্রেতা এবং পণ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর পারস্পরিক সম্পর্ককে শুধু নিয়ম নীতির অধীন রাখার জন্য অত্যন্ত দূরদর্শিতামূলক এবং ইনসাফ ভিত্তিক রীতি–নীতি রচনা করেছে। এমনকি প্রত্যেক হকদার নিজের হক আদায় করে এবং কোন ব্যক্তি অথবা দল অন্য কোন ব্যক্তি বা দলের অধিকার পদদলিত করার চেষ্টা করে না।

ইসলামী ব্যবস্থার প্রকৃতিই হলো যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং তা লোকসানের খাতে ব্যবহার করে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এটা হলো আবশ্যিক কর্তব্যের ব্যাপার। বস্তুতঃ ইসলাম জাতির শক্তি এবং সম্পদ ও জাতির লোকদের প্রচেষ্টাকে মদ পান, খেলাধূলা, রংতামাশা এবং অন্যান্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য খারাপ কাজে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচায়। যে জাতীয় শক্তি ও সম্পদ এইসব বাজে এবং ফিতনা ফাসাদের কাজে ব্যয় হয় ইসলাম নিজের আইন ও হুকুম–আহকামের মাধ্যমে তা থেকে বিরত রেখে তার গতি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ফিরিয়ে দেয়। যে জাতি প্রত্যূষে উঠে ওজু করে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দিনের কাজ শুরু করে নিঃসন্দেহে এই জাতির উৎপাদন সেই জাতির তুলনায় অনেক বেশী, যে জাতি অর্ধেক অথবা তারচেয়েও বেশীরাত ফিসক–ফজুর, নফসপূজা এবং খেলাধূলায় মশগুল থেকে যখন সকালে অতি কষ্টে ঘুম থেকে জাগে ও নিজের কাজে গমন করে। এই অবস্থায় সে নিঃসন্দেহে তিরিক্ষে মেজাজের, দুর্বল এবং কম হিম্মতের হতে বাধ্য।

ইসলামী ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতি অনুসারে এমন যে, তা যদি পুরোপুরিভাবে জারি করা হয় তাহলে যে সমাজে তা জারি করা হবে তার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হবে। সেই সমাজে বেকার ও ফকিরের সংখ্যা তুলনামূলক কম হবে। আর যখন কোন সমাজে ফকিরের সংখ্যা কম হয়, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হয় এবং বিত্তশালীরা নিজের সম্পদ ব্যয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে তাহলে সেই সমাজের সমস্যা সহজভাবেই সমাধান হয়। বরং এই ধরনের কোন সমস্যাই সৃষ্টি হয় না। যদি হয়ও তাহলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না যা সমাজের জন্য এক স্থায়ী ভীতি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন জায়গীরদারি এবং পুঁজিবাদী সমাজে হয়ে থাকে। সেখানে অনেক বিপ্লব আসে এবং বৈধ অবৈধ নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চলে। এরপর পুঁজিবাদী এবং জায়গীরদারির নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার পেট থেকে এমন ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যাতে আরও নির্যাতন এবং ফিতনা-ফাসাদের তান্ডব বয়ে যায়। এই হলো মুখোশধারী কমিউনিজম অথবা সমাজতান্ত্রিক অবস্থা। ইসলাম আইন ও হুকুম আহকামের মাধ্যমে দারিদ্র্যের পেছনে ধাওয়া করে এবং গরীবদেরকে বিত্তশালী বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম অবলম্বন করে। ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু ফকির এবং গরীব যদি থেকেও যায় তাহলে তাদেরকে কোন অবস্থাতেই একটি শ্রেণী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। যাকে ফকির শ্রেণী বলা হয়। শ্রেণী ভিত্তিক সমাজের শর্ত হলো তা আইন ও প্রথার সাহায্যে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। কিন্তু ইসলামের আইন-কানুন সমূহ এবং বিভিন্ন যুগে তার অনুসরণকারীদের সৃষ্ট প্রথা সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর ওপর দারিদ্র্যকে এমনভাবে আপতিত করে না যে পুত্র ও পৌত্র তার বাপ দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা পাবে। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য কোন স্থায়ী বস্তু নয়। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর হয়। ফকিররাওতো মানুষ। হতে পারে যে ব্যক্তি আজ ফকির আগামীকাল সে ধনীও হয়ে যেতে পারে। কেননা ইসলামী সমাজে ইনসাফ ভিত্তিক সুযোগ এবং বৈধ বস্তু লাভের আকাংখার দরজা সবার জন্যেই খোলা রয়েছে। ইসলামী সমাজে দরিদ্র্যতার কারণে গরীবের মানসম্মানের কোন কমতি হয় না। তার অধিকারও পদদলিত হয় না। কেননা ইসলাম নিজের সমাজের ব্যক্তিকে এই শিক্ষা দেয় যে, সমাজে মান-ইজ্জতের মাপকাঠি বিত্ত বৈভব, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অথবা সোনা-রূপা নয়। বরং মান-ইজ্জতের মাপকাঠি হলো জ্ঞান, ঈমান, তাকওয়া এবং আমলে সালেহ। আল্লাহ পাক বলেছেনঃ ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম (আল হুজরাত ঃ ১৩) "অবশ্যই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে বেশী সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে বেশী পরহেজগার।" ইয়ারফায়ুল্লাহুল্লাজিনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাজিনা উতুল ইলমা দারাজাত (আল মুজাদিলাঃ ১১) "আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যকার আহলে ঈমান এবং আহলে ইলমের মর্যাদা বেশী করে দেবেন।"

ওয়ামা ইয়াসতাবিল আর'মা ওয়ালবাসির ওয়াল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়ালাল মাসি। "অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বরাবর হতে পারে না এবং যারা ঈমান এনেছে ও ভালো কাজ করেছে তারা এবং বদকাররা এক হতে পারে না।"

জাহেলী যুগের আরব সমাজে ব্যক্তির মান-ইজ্জতের কষ্টিপাথর ছিল তার ধন-সম্পদ। যার যত বেশী ধন-সম্পদ ছিল তার মান ও প্রতিপত্তি বেশী ছিল। এমনকি সেই সমাজের মানুষ হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) নবুয়তের ওপর সর্বপ্রথম এই অভিযোগই উত্থাপন করেছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ফকির এবং গরীব মানুষ। তারা বলতো, আহা! আল্লাহর ওহি যদি মক্কা এবং তায়েফের দুইজন প্রখ্যাত বিত্তবান ব্যক্তি ওলিদ বিন মুগিরাহ কারাশী এবং উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফির মধ্য থেকে কোন একজনের ওপর নাজিল হতো! কুরআন মজিদের সুরায়ে জুখরুফে বলা হয়েছেঃ ওয়া কালু লাওলা নুজজিলা হাজাল কুরআনু আলা রাজুলিমমিনাল আরইয়াতাইনি আজীম (জুখরুফঃ ৩১) "এবং তারা বলে থাকে কেন নাজিল করা হয়নি এই কুরআন কোন মানুষের ওপর যে ঐ দুই শহরের মর্যাদাশালী ব্যক্তি।"

ইসলামের আগমনের পর মানুষের মান-ইজ্জতের সেই পরিমাপক যন্ত্রকে ভুল বলে আখ্যায়িত করলো এবং এটা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল যে, মানবতার প্রকৃত মূল্যায়ন বস্তু হলো ঈমান ও আমল। বিশাল বপু, সোনা, রূপা ঠাঁট-বাট এগুলো তো প্রকাশ্য বস্তু। সুতরাং রাসুলে মকবুল (সঃ) ফরমিয়েছেনঃ "অনেক মানুষ এমনও আছে যাদের চুল উস্কোখুস্কো এবং চেহারা মলিন। পরনে ছিন্নবস্ত্র। তাদেরকে কেউ কেয়ারই করে না। যদি তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কসম খেয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সত্যি করেই দেখিয়ে দিতে পারেন।" এর বিপরীত তিনি এ কথাও ফরমিয়েছেনঃ কিয়ামতের দিন বড় মোটা তাজা বপুধারী একজন মানুষ আসবে। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা একটি মাছির সমানও হবে না। তোমরা যদি চাও তাহলে এই আয়াত পাঠ করে নাওঃ ফালা নুকিমুলাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াযানান (কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমরা কোন ওজন কায়েম করবো না)।

বস্তুত মানুষ আদর্শিক নীতির তুলনায় বাস্তব ঘটনা বেশী বিশ্বাস করে। এজন্যে আমরা এখানে কতিপয় জীবন্ত উদাহরণ পেশ করবো। যেসব উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। এসব উদাহরণে সুস্পষ্টভাবে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে ইসলামী ব্যবস্থা কিভাবে মুকাবিলা করেছে এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ও ন্যায় এবং ইনসাফের ভিত্তিতে কেমন করে স্বচ্ছলতা ও সুখ শান্তির জীবন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, এই স্বচ্ছলতা ও সুখশান্তির জীবন শুরুর পূর্বেই রাসুলে খোদা (সঃ) মুজিজা হিসেবে এসব বলে দিয়েছিলেন। হজরত রাসুলে করিম (সঃ) আল্লাহর ওহির মাধ্যমে এই জীবন ব্যবস্থার আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তার

উম্মাতকে অবহিত করেছিলেন। যা আল্লাহ্ পাক হেদায়াত, রহমত এবং নিয়ামত স্বরূপ তাঁর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন। এই জীবন ব্যবস্থা আজও উত্তম ফল দিতে পারে যদি তা ভালোভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জারি করা হয় ও তার আহকাম এবং হেদায়াত থেকে পুরোপুরি ফায়দা নেওয়া হয়। এই জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা, সার্বিক সুখ-শান্তি এবং সামষ্টিক কল্যাণের এক নবতর যুগের সূচনা হবে। এমনকি যখন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ধরাপৃষ্ঠে তার ভিত্তিসমূহ প্রোথিত হবে তখন সমাজে সাদকা এবং যাকাতের হকদার অথবা তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না।

সহীহ বুখারীতে আদি বিন হাতেম তায়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হুজুর (সঃ)-এর খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অভুক্ত থাকার অভিযোগ আনলো। অতঃপর আর এক ব্যক্তি আসলো এবং সে রাহাজানির অভিযোগ আনলো। বস্তুতঃ আদি ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলের (সঃ) কাছে এসেছিলেন এবং আল্লাহর রাসূলের সন্দেহ হলো, সে এই কথায় ভীত হয়ে না পড়ে যে ইসলাম অনুসারীরা দুর্বল ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এবং তাদের দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। এজন্যে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের অনুপ্রেরণা দান এবং নিজের ইচ্ছাশক্তির ওপর মজবুত থাকার সেই সব সুসংবাদ শুনালেন যা উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বললেন, হে আদি! তুমি কি হায়রা দেখেছ? সে বললো আমি তো দেখিনি, তবে অবশ্যই শুনেছি। তিনি বললেন, "তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তাহলে দেখবে যে একজন মুসাফির মহিলা হায়রা থেকে একাকী রওয়ানা হবে এবং কা'বার চারপাশে তাওয়াফ করবে। আল্লাহ ছাড়া কারোর ভয় তার অন্তরে থাকবে না।" অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যে, উট কোন রক্ষক ছাড়াই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেবে।"

হাদীস বর্ণনাকারী আদি বলেন, আমি মনে মনে বললাম তাহলে গোত্রের সেই সব ছিনতাইকারী কোথায় যাবে, যারা সমগ্র দেশব্যপী ফিতনা ফাসাদ এবং লুটতরাজের রাজত্ব কারয়ম করে রেখেছে অর্থাৎ সেই যুগে তার কাছে কথাটি একদম অবিশ্বাস্য মনে হলো। এত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে কোন মহিলা একা একা হায়রা থেকে মক্কা যাবে অথচ রাস্তায় কেউ তাকে রাহাজানি করবে না। সে শুধু নিজের গোত্রের ফিতনাবাজ এবং ছিনতাইকারীদেরকে জানতো। যারা আল্লাহর বান্দাহদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফিতনা-ফাসাদের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের কথা পুরোপুরি বলে তাকে বললেন, "তুমি যদি দীর্ঘ জীবন পাও তাহলে তোমরা কিসরার কোষাগার দখল করবে।" আদি বললো "কিসরা বিন হারমুজ !"

তিনি বললেন, "কিসরা বিন হারমুজ ! যদি তোমাদের জীবন দীর্ঘ হয় তাহলে তোমরা দেখবে যে এক ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে হাত ভরে সোনা রূপা বের করবে এবং কেউ গ্রহণ করুক এ জন্য খোঁজ করতে থাকবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকেই পাওয়া যাবে না।"

হযরত আদি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং তিনি স্বয়ং সেসব দেখলেন যার সুসংবাদ নবী করিম (সঃ) দিয়েছিলেন। আদি বলেন, আমি দেখলাম একজন মহিলা হায়রা থেকে কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় তার অন্তরে ছিল না। আর আমি সেইসব মানুষের মধ্যে একজন ছিলাম যারা কিসরা বিন হারমুজের কোষাগার দখল করেছিল। যদি তোমরা দীর্ঘ জীবন পাও তাহলে তোমরা অবশ্যই নবী করিমের (সঃ) ফরমানের বাস্তব নমুনা দেখবে এবং ফকির একদমই থাকবে না।

রাসূলে খোদার (সঃ) আদি বিন হাতেমকে এই কথা বলা যে 'যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয় তাহলে তুমি দেখবে যে জনৈক ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে হাত ভরে সোনা রূপা বের করবে" --একথা এটাই প্রমাণ করে যে, এগুলো এত অদূর ভবিষ্যতে হবে যে সাহাবাদের মধ্যে যারা দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হবেন তারা তা দেখতে পাবেন। আর এসব কিছুই খলিফায়ে আদিল হজরত ওমর বিন আব্দুল আজীজের খিলাফত কালেই ঘটেছিল। তার বর্ণনা সামনে দিব। এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর সম্পদের এত আধিক্য হবে যে, সাদকা এবং যাকাতের মুস্তাহিক লোকদের সমাজে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সন্দেহাতীতভাবে এই কথা বলা যায় যে, সম্পদের আধিক্য এবং দারিদ্র্য ও বুভূক্ষা না পাওয়া যাওয়া সম্পর্কে মাসুম রাসুলের (সঃ) ফরমান তাঁর নিজস্ব কোন কথা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যেকার দারিদ্র্য ও বুভূক্ষা দূর করার জন্য আবেগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি একথা বলেছিলেন। এর বিপরীতে তওরাতে লিখা আছে যে, দারিদ্র্য ও বুভূক্ষা স্থায়ী বস্তু। দুনিয়ার বুক থেকে দারিদ্র্য খতম হতে পারে না। এখন আমরা নীচে এমন কিছু হাদীস পেশ করবো যা মুসলিম সমাজে দারিদ্র্য ও বুভূক্ষার নাম নিশানা মিটানোতে কাজ করেছিল।

বুখারী প্রমুখরা হারিসা বিন ওয়াহাব খাজায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসুলে মকবুলকে (সঃ) বলতে শুনেছি যে দান করে নাও। কেননা তোমাদের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন কোন মানুষ সাদকা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণের লোক পাবে না। বরং প্রত্যেকেই সেই সাদকা দানকারীকে এই কথাই বলবে যে, "যদি আপনি কাল আসতেন তাহলে আমি এই সাদকা কবুল করতাম। কিন্তু আজ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ধন–সম্পদের এত আধিক্য না হবে যে বিত্তবান ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে যাবে, যে তার সাদকা কবুল করে নেবে এবং সে তার নিজের সম্পদ থেকে সাদকা এবং যাকাত পেশ করবে। তবে যে ব্যক্তি তা পেশ করবে সে বলবে "আমার কোন প্রয়োজন নেই এবং পাওয়ার ইচ্ছাও নেই।" হযরত আবু মুসা আশয়ারী থেকেও বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সঃ) বলেছেন যে "এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি নিজের সোনা দানা প্রভৃতির যাকাত দেওয়ার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু সে কোন যাকাত গ্রহণকারী পাবে না।"

হযরত নবী করিমের (সঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর বেশী দিন গত হয়নি। মুসলমানদের কাছে এত ধন সম্পদ এসেছিল যে সমগ্র যাকাতের মুসতাহিক কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন মুসলমানরা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, আদিল শাসক এবং খিলাফতে রাশেদাহ পেয়েছিল। আর এসব কিছুই হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজের যুগে পরিপূর্ণভাবে ছিল।

ইমাম বায়হাকী 'আদদালায়েল' নামক কিতাবে ওমর বিন আসইয়াদ বিন আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ শুধু আড়াই বছর মুসলমানদের শাসক ছিলেন। আল্লাহর কসম! তার যুগে কোন ব্যক্তি অনেক সম্পদ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলতেন, যেখানেই ফকির মিসকিন দেখ, দিয়ে ফেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ব্যক্তি নিজের সম্পদসহ ফিরে আসত এবং বলতো এই সম্পদ নেওয়ার মত কোন লোক আমি পেলাম না। কেননা ওমর (রঃ) লোকদেরকে বিত্তশালী বানিয়ে দিয়েছেন।"

ইমাম বায়হাকী এই হাদীস বর্ণনার পর বলেছেন যে, এই হাদিস সেই হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করে যা আমরা আদি বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছি।

ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বলেছেন, "আমাকে হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রঃ) আফ্রিকী এলাকায় সাদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করলেন। আমি সাদকাহ আদায়ের পর তা বন্টনের জন্য সেই এলাকার ফকিরদেরকে ডেকে পাঠালাম। কিন্তু আমি সেই এলাকায় ফকির পেলাম না। এবং আমি নিজের এলাকায় যাকাত ও সাদকা গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি পেলাম না। কেননা ওমর বিন আবদুল আজীজ লোকদেরকে বিত্তশালী বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সাদকার সেই অর্থ দিয়ে আমি কতিপয় কয়েদী খরিদ করে আজাদ করে দিলাম। হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজের শাসনকালের আগেই এমন ধরনের এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ হজরত ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) শাসনকাল। যখন কতিপয় এলাকা ইসলাম এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন দ্বারা

অভিষিক্ত ছিল। জনগণ বিত্ত বৈভবের মালিক ছিল। এর বরকতে এলাকাবাসী উপকৃত হচ্ছিল। বস্তুত ইয়েমেনে নবী করিম (সঃ) মায়াজ বিন জাবালকে এবং তারপরে অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে হজরত আবু বকর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) নিয়োগ করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের মত একজনও তারা পাননি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে হজরত ওমর (রাঃ) দারুল খলিফা এবং রাজধানী মদীনায় সমস্ত যাকাত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থের লিখক আবু ওবায়েদ হজরত মায়াজের সেই রেওয়াতে কিভাবে বর্ণনা করেছেন তা দেখুন। তিনি লিখেছেনঃ

যখন হজরত রাসূলে আকরাম (সঃ) মায়াজ বিন জাবালকে (রাঃ) ইয়েমেন প্রেরণ করলেন, তখন তিনি হজরত রাসূলে করিম (সঃ) এবং হজরত আবু বকরের (রাঃ) ওফাত পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীর সাথেই রইলেন। অপঃপর তিনি হজরত ওমরের রাঃ) নিকট এলেন। তিনিও তাকে পুনরায় সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত মায়াজ ইয়েমেনবাসীর কাছ থেকে সাদকা আদায় করে তার এক–তৃতীয়াংশ খলিফাতুল মুসলিমুন হজরত ওমরের কাছে পাঠালেন। তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং তাঁকে বলে পাঠালেন যে, "আমি তোমাকে শুধুমাত্র সাদকা এবং জিযিয়া প্রভৃতি আদায়কারী হিসেবে পাঠাইনি। বরং আমি তোমাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, তুমি বিত্তশালীদের কাছ থেকে সাদকা প্রভৃতি নিয়ে তা গরীব এবং ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দেবে।" হজরত মায়াজ জবাব দিলেন, "আপনাকে কোন জিনিস এমন অবস্থায় পাঠাইনি যে এখানে আমি তা গ্রহণ করার মত লোক পেয়েছি।" অতঃপর যখন দ্বিতীয় বছর এলো তখন হযরত মায়াজ (রাঃ) ইয়েমেনবাসীর সম্পূর্ণ সাদকার অধিক অংশ হজরত ওমরকে (রাঃ) প্রেরণ করলেন। আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর (রাঃ) এবং হজরত মায়াজের মধ্যে পুনরায় সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এরপর যখন তৃতীয় বছর এল তখন হজরত মায়াজ (রাঃ) সম্পূর্ণ যাকাতই হজরত ওমরের (রাঃ) কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি পুনরায় আগের মতই তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই একই কথা বলে পাঠালেন যা পূর্বে বলেছিলেন। এরপর হযরত মায়াজ (রাঃ) জবাব দিলেন, "এখানে আমি এমন একজনকেও পাইনি যে আমার কাছ থেকে যাকাত প্রভৃতি গ্রহণ করবে।"

আল্লাহ, আল্লাহ! এই হাদীস কত মর্যাদাবান এবং উত্তম। এই হাদীস যা আমরা পুস্তকাদিতে শুধু পাঠ করি। তার ওপর বিশেষ কোন দৃষ্টি দিই না। এথেকে জানা যায় যে, ইসলাম এবং তার সামষ্টিক ইনসাফ কয়েক বছরের মধ্যে কিভাবে মুসলমানদেরকে ধনবান, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর এবং দৃঢ় করেছিল যা উল্লিখিত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বে কি এ ধরনের কোন উদাহরণ আছে? হজরত ওমরের পূর্বে বিশ্ববাসী কি এমন কোন শাসক প্রত্যক্ষ করেছে যে তিনি নিজের

গভর্ণরকে বিভিন্ন এলাকা থেকে ধনসম্পদ একত্র করে রাজধানীতে প্রেরণ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁকে বলেন, আমি তোমাকে এ জন্য গভর্ণর বানিয়ে পাঠাইনি যে তুমি নিজের এলাকা থেকে কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স আদায় করে আমার কাছে পাঠাবে। যেমন জা বাদশাহরা করে থাকেন।

সাহাবী মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হজরত ওমরকে (রাঃ) এ কথার ইয়াকিন না ওয়াতেন যে, তার এলাকায় অর্থনৈতিক ইনসাফের স্বর্ণ যুগ চলছে এবং তিনি বস্তু তাকে এমন অবস্থায় প্রেরণ করেছেন না যে তাঁর এলাকায় সে বস্তু কারোর প্র..জন রয়েছে। তাহলে তিনি সেই এলাকার বিত্তশালীদের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে ধানকার ফকিরদের মাঝে বন্টনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এটা কেমন করে পারে যে, হজরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) নিজের এলাকায় গরীবদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে যাকাত এবং সাদকা ল মুমিনুনের কাছে প্রেরণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি সেই ব্যক্তি যাকে রা ইয়েমেন প্রেরণের সময় ফরমিয়েছেনঃ "সেখানকার বিত্তশালীদের কাছ নিয়ে ফকির এবং মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দেবে।"

সমগ্র এলাকার মুসলমান একই উম্মত। অতএব যখন কোন বিশেষ এলাকার বাসিন্দারা যাকাত এবং সাদকার মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যাবে এবং সেখানকার বিত্তবানদের সম্পদের যাকাত থেকে গরীবদের প্রয়োজনাবলী পূরণের পর কিছু বেঁচে থাকবে তখন তা দিয়ে অন্য কোন এলাকার গরীবদের প্রয়োজন পূরণ করা ফরজ। অথবা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত যে, সে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত যাকাত এমন কাজে ব্যয় করবে যাতে মুসলমানদের সামষ্টিক এবং দ্বীনি দিক থেকে কল্যাণ নিহিত থাকে। যখন এবং যেখানে ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের সুযোগ হয়েছে, তাতে ওপরে বর্ণিত ফলই পাওয়া গেছে। আর এই মুসলমান জাতি দুর্ভাগ্যবশত এই নজিরবিহীন জীবনব্যবস্থার বরকত থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তার কারণ হলো, জালেমরা তার ওপর জোরপূর্বক চেপে বসে আছে এবং ধনসম্পদের ওপর বেওকুফ ও অন্ধ বুদ্ধিবাজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অজ্ঞতা ও বিদয়াত দ্বীনকে ভেঙ্গে খান খান করে রেখেছে।

বিশ্বের ঘটনাবলী থেকে পেশকৃত এই সব উদাহরণে সেই সকল লোকের ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে যায়, যারা দারিদ্র্যকে এক চিকিৎসাহীন রোগ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মনে করে। এই সব উদাহরণ থেকে এটাও জানা যায় যে, তারাও সরাসরি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যারা মনে করে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা ইসলামী সমাজে তৈরীকৃত ফকির-মিসকিনদের অস্তিত্বের প্রয়োজনের সরকারী স্বীকৃতি। মুসলিম সমাজে গরীব এবং ফকিরদের অস্তিত্ব কোন প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। বরং এটা সাময়িক